KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M T AMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication: ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection KLMLGK	Publisher আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title সমকালীন (SAMAKALIN)	Size 7"x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol & Number 22/- 22/- 22/- 22/- 22/-	Year of Publication মাঘ ১৩৮০ ॥ Feb 1974 ফাল্গুন ১৩৮০ ॥ March 1974 ভাদ্র ১৩৮১ ॥ Sep 1974 কার্তিক ১৩৮১ ॥ Nov 1974 অগ্রহায়ণ ১৩৮১ ॥ Dec 1974
	Condition Brittle Good ✓
Editor : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks

C.D. Roll No. : KLMLGK

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

দ্বাবিংশ বর্ষ ॥ ভাদ্র ১৩৮১

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

দার্জিলিঙে টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয়ের অপরূপ দৃশ্য দেখুন

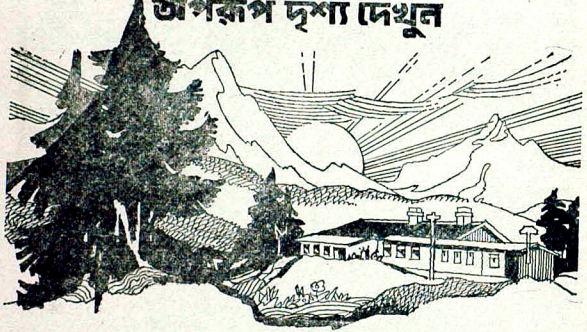

দার্জিলিঙ……সারা বিশ্বের ভ্রমণপিপাসুদের অন্যতম সেরা আকর্ষণ। শরীর-মন জুড়ানো বাতাস আর অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা সেই শৈলনগরী।

সেই কাঞ্চনজঙ্ঘার মহিমান্বিত রূপ, দূরে আবছা রহস্যময় নীলাভ শৃঙ্গের সারি, পরিব্যাপ্ত নিস্তব্ধতা আর প্রশান্তি।

তবু সব আকর্ষণকেই ছাপিয়ে যায় টাইগার হিল থেকে দেখা সূর্যোদয়। সেই সারারাত দুরু দুরু বুকে প্রত্যাশায় কাটানো, তারপর দূরে অগণিত পর্বতশৃঙ্গের ভিড়ে এভারেস্টের ফাঁকে তাকিয়ে সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষা।

নবীন সূর্যের কিরণে কাঞ্চনজঙ্ঘার শুভ্র তুষারপুঞ্জকে মুহূর্তে সোনায় রূপান্তরিত হতে দেখেছেন? দেখেছেন কি পুব আকাশকে কয়েক মুহূর্তের জন্য সপ্তাশ্ববাহন সূর্যের সাত রঙের আভায় উদ্ভাসিত হতে? যদি না দেখে থাকেন তবে আসুন দাজিলিঙ–সেখান থেকে টাইগার হিল…মাত্র ১১ কিলোমিটার। দাজিলিঙ ট্যুরিস্ট লজ থেকেই গাড়ী পাবেন। টাইগারহিল ট্যুরিস্টলজে আরামদায়কথাকার এবং খাবার ও পানীয়ের ব্যবস্থা আছে।

বিশদ বিবরণ ও রিজার্ভেশনের জন্য যোগাযোগ করুন :

ট্যুরিস্ট ব্যুরো

অজিত ম্যানসন, নেহরু রোড, দাজিলিঙ ফোন : ৫০, গ্রাম : DARTOUR

পর্যটন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

TCP/TB 208 RA I/74

দ্বাবিংশ বর্ষ ৫ম সংখ্যা ভাদ্র তেরশ' একাশী

সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সাম্প্রতিক হিন্দী কবিতার দুচার কথা ॥ মধুছন্দা সেন ১৮১

লৌকিক বিধিনিষেধ ॥ অমলেন্দু মিত্র ১৮৭

লোকসাহিত্যের এক দিক—গ্রাম্য 'তন্ত্রমন্ত্র' ॥ ত্রিপুরা বসু ১৯২

তুহফত দর্পণে রামমোহন মানস ॥ গোরাচাঁদ মিত্র ২০১

সুরের কবি নজরুল ॥ অমলকুমার মিত্র ২০৬

মানভূমের কথ্য শব্দার্থ ॥ রামশঙ্কর চৌধুরী ২১২

সমালোচনা : লোথাল অ্যাণ্ড ইণ্ডাস সিভিলাইজেশন ॥ সন্তোষকুমার বসু ২১৫

সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

বিনা টিকিটে ভ্রমণ জাতির কোটি কোটি টাকা ক্ষতি করে

আর এই লোকসানের কড়ি গুণতে হয় আপনাকেই

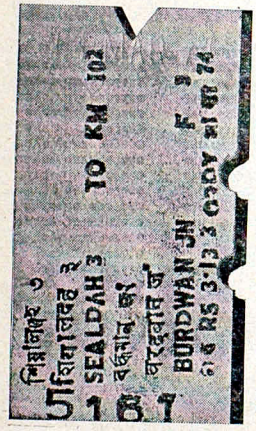

আমরা চাই সবাই আপনার মতোই সৎ হোন; সবাই আপনার মতো টিকিট কিনেই রেলে যাতায়াত করুন।

কিন্তু অনেকে তা করেন না—আর করেন না বলেই প্রতি বছর ভারতীয় রেলওয়েকে বিনা টিকিটে ভ্রমণের দরুন কোটি কোটি টাকা খেসারত দিতে হয়!

এই ক্ষতি কিন্তু আপনারও। কারণ ভাড়ার টাকা থেকেই আপনার রেল ভ্রমণের সুযোগ-সুবিধা, রেল কামরার উন্নয়ন, রেল প্ল্যাটফর্মের সংস্কার এবং রেল চলাচলের স্বাচ্ছন্দ্য বাবদ খরচ-খরচা করা হয়। উপরন্তু, ভেবে দেখুন তো, ভাড়ার কড়ি গুণছেন আপনি—অথচ আপনার প্রাপ্য আসনটি হয়তো দখল করে রেখেছেন একজন বিনা টিকিটের যাত্রী।

বিনা টিকিটে ভ্রমণের অভ্যাস বন্ধ করতে সাহায্য করুন। আর এজন্যে টিকিট পরীক্ষকদের সমর্থন করুন।

বিনা টিকিটে ভ্রমণ—
সৎ মানুষদেরই ক্ষতি করে।

INDIAN RAILWAYS
পূর্ব রেলওয়ে

TCP/ER775A

ভাদ্র
তেরশ' একাশী

সমকালীন

দ্বাবিংশ বর্ষ
৫ম সংখ্যা

সাম্প্রতিক হিন্দী কবিতার দুচার কথা

মধুছন্দা সেন

ষাটের দশকে সমগ্র হিন্দী সাহিত্যে যে নবচেতনা ও প্রগতির লক্ষণ দেখা যায়, তার মধ্যে হিন্দী কাব্যের দিক্‌পরিবর্তন বিশেষভাবে চমক লাগায়। বিগত দশবছরে হিন্দী পত্রপত্রিকা ও একক কাব্য সংকলনের মাধ্যমে অসংখ্য আধুনিক কবিতা জন্ম নিয়েছে। প্রকাশিত সাহিত্য দিয়ে যদি হিন্দী কাব্যের সাহিত্যিক মান নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয় তবে এই দশবছরের ছাপানো কবিতাগুলি পড়ে নিঃসন্দেহে বলা চলে হিন্দী কবিতা নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। এখন তাকে সমৃদ্ধ প্রতিবেশী সাহিত্যের বলিষ্ঠ প্রতিযোগী বলা চলে। অনুভূতির বিস্তৃত পরিধি ভাষার মৌলিক ব্যবহার, কাব্যদেহে শুধুই লালিত্য ও সুষমার চর্চার পরিবর্তে সজীবতা ও শক্তির অনুশীলন—সবই এই অগ্রগতির লক্ষণ।

স্বাধীনতার আগে হিন্দী কাব্য ছিল 'লৌরিক' 'ব্যালেড' ও 'দোহা' শ্রেণীর—এককথায় ছন্দাশ্রয়ী ভাবপ্রধান ও বর্ণনাত্মক। স্বাধীনতার পরে রাজনৈতিক ও জাতীয় জীবনের আবর্তনে হিন্দী কবিতার অবিমিশ্র ভাবস্রোত স্বভাবতঃই ব্যাহত হল। হিন্দী কবিতার সনাতন রূপরেখা (সুললিত পদাবলীর মাধুর্য ও দোহার সহজিয়া শৈলী) ছাপিয়ে জেগে উঠল কবিতার দীপ্ত ভাব ও ওজোগুণ। চল্লিশ দশকের উত্তরার্দ্ধে নবলব্ধ স্বাধীনতা ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রশস্তি নিয়েই বেশীর ভাগ কবিতা লেখা হয়েছে। পঞ্চাশ দশকে হিন্দী কবিতা মোড় ফিরে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ নিল। মৈথিলীশরণ গুপ্ত, সুমিত্রানন্দন পন্ত, নিরালা, মহাদেবী বর্মা, বচ্চন, দিনকর প্রভৃতি কবিগণ হিন্দী কাব্যে আনলেন ছায়াবাদ ও রহস্যবাদের এক অনচ্ছ পরিমণ্ডল, ও বলিষ্ঠ ছন্দ রচনা। এঁরাই প্রথম হিন্দী কবিতাকে ভক্তিরসের বিহ্বলতা ও বীররসের ঘনঘটা থেকে মুক্ত করলেন। কিন্তু ছায়াবাদী

কবিতাও ব্যতিক্রম নয়, একে গ্রাস করল এক অন্য ধরণের অতি ভাবালুতা। এদের কাব্যের প্রধান উপজীব্য বিষয় হল প্রকৃতি ও অতীন্দ্রিয় প্রেম। মহাদেবী বর্মা, পন্থ ও নিরালার কাব্যে ছিল সৌখীন নন্দনতত্ত্বের প্রভাব। ছায়াবাদী কবিরা প্রধানতঃ জীবনবিমুখ আত্মকেন্দ্রিক কবিতা লিখেছেন।

ষাটের দশকের হিন্দী কবিতা যেন হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে এক নতুন প্রত্যুষ দেখা। এই দশকের কবি কারা? তাঁরাই, যাঁরা স্বাধীনতার পরে ধীরে ধীরে অনিশ্চিত জীবনযাত্রার বিভীষিকাকে ডানা মেলতে দেখছেন। এরা সন্ত্রাস কবলিত ক্ষয়িষ্ণু সমাজের শিক্ষিতশ্রেণী। এরা অবসর বিনোদনের জন্য কিংবা কোনও বিলাস-ব্যসন চরিতার্থ করার জন্য কবিতা লেখেননি। কবিতাগুলি কিয়দংশে যুগযন্ত্রণার প্রাতক্রিয়া আবার কখনও ভিন্ন চোখে দেখা জীবনের আলেখ্য। ষাটের দশকের হিন্দী কবিতা বাস্তব-জীবনের মত সাদামাটা—এর বিষয়বস্তু সর্বজনগ্রাহ্য। সাম্প্রতিক কালের হিন্দী কবিরা (মানিক বর্মা, প্রভাকর মাচবে, জগদীশ গুপ্ত, কেদারনাথ সিংহ, ধর্মবীর ভারতী, শ্রীবাস্তব বর্মা, রামদরশ মিশ্র প্রভৃতি। ভিন্ন ভিন্ন মেজাজে বৈচিত্র্যপূর্ণ আঙ্গিকে প্রকৃতার্থে 'নয়ী কবিতা' লিখেছেন। উল্লিখিত কবিরা বাংলা ও বিদেশী কাব্যশৈলী থেকে গ্রহণ করেছেন অনেক নতুন উপাদান, কিন্তু বয়সে তরুণ এই কবিদের মৌলিক প্রতিভা অনস্বীকার্য। পূর্ব প্রতিষ্ঠিত 'ছায়াবাদে'র প্রতিক্রিয়াস্বরূপ জন্ম নিয়েছে ষাটের দশকের নয়া আন্দোলন। হিন্দীতে যার নাম—'নকারবাদ' (যাবতীয় পরম্পরা অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করার মানসিকতা)। এই নয়া আন্দোলন প্রধানতঃ চারভাগে বিভক্ত :—১ নকারবাদ ২ প্রগতিবাদ ৩ উগ্রপন্থী ৪ নান্দনিক (প্রেম ও প্রকৃতির কবি)। এককথায় বলতে হয় এই নূতন কবিতার যে সামগ্রিক স্বরূপ—সামাজিক বিপ্লব তার পটভূমি মাত্র, ব্যক্তির বিশেষ উপলব্ধি ও বিশিষ্ট চিন্তাধারাই তার প্রধান বস্তু। প্রথম পর্যায়ের কবিদের মধ্যে (নকারবাদী) ডঃ জগদীশ গুপ্ত, 'মুক্তিবোধ', শ্রীঅজ্ঞেয়, ভারতভূষণ, গিরিজাকুমার মাথুর, রাওত, পরমানন্দ শ্রীবাস্তব প্রভৃতি সুপরিচিত। এরা কাব্যের সনাতন নিয়মাবলী অমান্য করতে গোড়া থেকে সচেষ্ট হয়েছেন। এদের বলিষ্ঠ ভঙ্গি, চড়া মেজাজ ও ছন্দের বৈচিত্র্য লক্ষ্যণীয় :—

'কোনো মহাকবি।
হোতাম যদি নিষাদ
(জীবহত্যা কি অপরাধ?)
দিতে যদি অভিশাপ
বিঁধতাম তোমাকে তৎক্ষণাৎ।
আহত, বিদ্ধ তুমি পারতে না নিতে তার প্রতিশোধ,
তুমি তো প্রেমিক নও (ক্রোঞ্চদ্বয়ের মত)
তোমার কি মাথাব্যথা!
এই আমি দিই শান
তুমি নও আদিকবি। আজ থেকে যে প্রেমিক
শুধু সে লিখবে শ্লোক।'

(জগদীশ গুপ্ত)

তরুণ কবি 'রাওত' লিখছেন ভিন্ন সুরে—

'কালকে বলবো কিছু
আজ তো সহ্য করি।
আজ মেঘে ঢাকা দিন।
কাল যদি ছিপছিপে গৌরী কিশোরী রোদ
আঙ্গিনা নিকিয়ে যায় চুপিসাড়ে।
ভোর হোক জানাবো মোরগটার সাথে কিছু প্রতিবাদ
(আজ তো সহ্য করি)

এ রকম উদাহরণ বহু আছে। সক্ষম অনুবাদের অভাবে রসাস্বাদনে বিঘ্ন ঘটতে পারে। এই শ্রেণীর কবিদের মধ্যে অনেকে লিখেছেন প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ মিশ্রিত হাস্য কবিতা, যথা :—

বর্তমান শুধালো অতীতে—
বাবা! এদিকে সীমাপ্রদেশ
ওদিকে সীমাপ্রদেশ
মাঝখানে তুমি আমি, ভারত কোথায়?
বাবা বলেন—শোনো বাছা! এইগুলি 'ফ্রন্ট বোর্ড'
এর মাঝে দেশ নেই।
তুমি আমি যেখানটা দাঁড়িয়েছি একসাথে
শুধু সেইটুকু দেশ—বিশাল ভারত।

(শ্রী মিশ্র)

'নকার বাদী' কবিরা কিন্তু নিরাশাবাদী কবি নন। সমস্তাবহুল পৃথিবীও তাদের কাছে প্রয়োজনীয় যেমন রামকুমার চতুর্বেদী লিখেছেন—

'স্বর্গে নেই দাহ
স্বর্গে নেই জীবনের গ্লানি
তাই যুগে যুগে মর্তে নামেন দেবতা'

ইতিমধ্যে ষাটের দশকেই উদ্ভূত হোয়েছেন কিছু উগ্রপন্থী কবি মেজাজে এরা অসহিষ্ণু, উদ্ধত। সাহিত্যে কোনও রূপ নিয়ম-শৃঙ্খলা বা অনুশাসন মেনে নিতে এরা রাজী নন। এদের ভাবও ভাষা এলোমেলো, বক্তব্য উদ্দেশ্যহীন, ভাষা ও ছন্দ ব্যাকরণবর্জিত ও অশুদ্ধ। এরা নিজেদের উগ্র আধুনিক প্রতিক্রিয়াবাদী কবি মনে করেন। রাজকমল চৌধুরী, কুনাল প্রভৃতি এই শ্রেণীর কবি এরা শুধু মাঝে মাঝে রব তুলেছেন, চমক লাগিয়েছেন কিন্তু কাব্য সাহিত্যে কোনো স্থায়ী ছাপ রেখে যেতে পারেন নি। এদের কবিতার বিষয়বস্তু প্রধানতঃ ক্ষুধা তৃষ্ণা, অতৃপ্তি ও বিকৃত কামবাসনা।

প্রগতিবাদী কবিরা নিজেদের সমস্ত খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিনিধি মনে করেন। এদের কবিতা মেহনতী মানুষের ইতিকথা, এঁদের সুরে সাম্যবাদী মানসিকতা সোচ্চার। প্রগতিবাদী কবি গোষ্ঠীর দুই পূর্বসূরী মৈথিলীশরণ গুপ্ত ও দিনকর হিন্দী কাব্য সাহিত্যের প্রখ্যাত স্তম্ভ। রাষ্ট্রীয়

চেতনা এঁদের কবিতায় সুস্পষ্ট। এঁদের কবিতা যেন এক একটি আগ্নেয়গিরি।

“যখন রবে না আর বাস্তুহারা মানবতা
নির্বিকার। পথে তুমি পাবে না রক্তছাপ
নিরপরাধ বিদ্রোহীর। ভাঙবে কারাপ্রাচীর
তখন এ চিঠি খুলো।”

(কিন্তু হায় এই শব্দগুলি বোধহয় শীঘ্র মুক্তি পাবে না।)

উদীয়মান প্রগতিবাদী কবি শ্রীকৃষ্ণ ভারতীয়ের পংক্তিগুলি লক্ষ্যণীয়, এদের উপমা, অলংকার ও বর্ণনাভঙ্গি নতুন—

‘প্রতিটি ‘সীতাহরণ পর্বে’ আমি জটায়ু
ডানাকাটা অথর্ব, কিন্তু নই রণবিমুখ
এখনও হাত বাড়াই, মারবো রাবণ তাই
ভাবি আজ কেড়ে নেবো সূর্যের যত তেজ’।

কিংবা রমেশ তেওয়ারীর লেখা—

‘অবশেষে বলি, শোনো! নিগূঢ় তত্ত্ব এক
আসলে আমিই ধৃতরাষ্ট্র
(সামান্য বুঝবার দৃষ্টিও নেই আজ)
চোখ বুজে বসে থাকি
কিন্তু যে কোনো যুগে জোটে এক সঞ্জয়
চিরকালে অনুগত—কেননা আমি রাজা’

চতুর্থ পর্যায়ের (নান্দনিক) কবিদের বিষয়বস্তু ও বাচনভঙ্গি ভিন্ন ধরনের। এরা যদিও কাব্যের চিরন্তন উপজীব্য প্রেম, প্রকৃতি ও সৌন্দর্য নিয়ে কবিতা লিখেছেন কিন্তু সেগুলির আধার নয় জোৎস্নারাত্রি, বুলবুলি শরাব ও বাগিচা। স্বপ্নময় রোমান্সের বদলে জন্ম নিয়েছে এতে ঘরোয়া প্রেমের আখ্যান ও পরিচিত পরিবেশের কাব্যিক বর্ণনা। নান্দনিক কবিদের মধ্যে আবার কয়েকজন ‘আঞ্চলিক কবি’ নামে পরিচিত (ঠাকুরপ্রসাদ সিংহ, কেদারনাথ সিংহ, ভারতী, রামদরশ মিশ্র, মণি মধুকর, ড. শম্ভুনাথ সিংহ প্রভৃতি)। এদের কবিতার বিষয়বস্তু কোনোও বিশিষ্ট অঞ্চলের প্রাকৃতিক রূপনিরূপণ, গ্রাম্য বালিকা, গ্রাম্য জীবনের যাবতীয় খুটিনাটি। প্রেমের নানা পর্বে কলম চালিয়েছেন রবীন্দ্র ‘ভ্রমর’ উমাকান্ত মালবীয়, প্রভাকর, ‘কালক’ শ্রীরাম সিংহ মাহেশ্বর তেওয়ারী সাবিত্রী পরমার ইত্যাদি অনেকে। ঠাকুরপ্রসাদের ‘গ্রাম্য’ একটি মিষ্টি কাব্য সংকলন। নান্দনিক কবিরা এমন এক ধরণের চিত্রময় কবিতাও লিখেছেন যা বিদেশী কবিতার কথা মনে করিয়ে দেয়:—

‘থরথরিয়ে কাঁপে শীতের হাওয়া
ওর চাই উষ্ণ পানীয়
ঢালুক না কিশলয় থেকে সঞ্চিত সুধারস
গাছের পেয়ালাগুলি সারি সারি সাজানো বাগানে’ —‘বিপ্লব’

এ ছাড়া ষাটের দশকে হিন্দীতে স্থূল ও সস্তা ভাঁড়ামোর বদলে খুজে পাওয়া গেল বেশ কিছু তীক্ষ্ণ

ব্যঙ্গাত্মক কবিতা। শৈল চতুর্বেদী, কাকা হাথরসী, কে, পী, সাক্সেনা হিন্দীর সফল হাস্যকবি। ব্যঙ্গ কবিতার প্রতিপাদ্য বিষয় হোলো—সমাজবাদ, নেতা, মন্ত্রীগণ, সমানান্তর চলচ্চিত্র, আধুনিক জীবনযাত্রা ইত্যাদি যথা:—

‘কে যেন বললো হেঁকে
ট্রেনের ভীড়ের মাঝে
শুনেছো কি? এসেছে ‘সমাজবাদ’!
—তাই নাকি? ধড়মড় কোরে উঠে
বললেন একজন—দ্যাখো ভাই’,
জাগিও কিন্তু ঠিক এলে পরে ফৈজবাদ’ —চতুর্বেদী

সাম্প্রতিক কালের হিন্দী কবিতার ছন্দ ও ভাষা নবসৃষ্ট। এই কবিতা অধিকাংশই অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা গদ্যাশ্রয়ী কাব্য। বাঁধাধরা ছন্দের বেষ্টনী ত্যাগ কোরে, তাল ও মাত্রার সমতা বজায় রেখে হাঁটি হাটি পা-পা কোরে চলার দিন কেটে গেল। কতকগুলি অর্থবহ শব্দ সংযোজনা মাত্রই এখন কবিতা। শুধু মাত্র পদলালিত্য ও যতি বিরতির প্রয়োগ দিয়েই বোঝা যায় এটা কবিতা, নিছক গদ্য নয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখনীয় পঞ্চাশ দশকেই মৈথিলীশরণ এবং নিরালা হিন্দীতে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রতিষ্ঠা কোরে গেছেন। পরবর্তীকালে কবিরা তাঁদের অনুসরণ কোরেছেন নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে। ‘নয়ী কবিতা’র শেষ কথা চলতি হিন্দী সেজন্য জনসাধারণের পাঠ্য। এর শব্দ রচনায় গজলের মত উর্দ্দুর বাহুল্য নেই, আবার ‘দোহা’ ‘সোরঠা’ ও ‘সবৈয়া’র মত ব্রজভাষা ও অবধীর বাঁধাধরা গৎ নেই। এই ‘বোলচাল কী হিন্দী’ একটি মিশ্রিত ভাষা। এখন হিন্দী গদ্যেও এই ভাষাই প্রচলিত। এখনও হিন্দীতে কবিতার পাঠক বিরল। শুধুমাত্র কবিতার নিয়মিত পত্রিকা একটিও নেই। ‘পাঠক ও কবি’র একমাত্র যোগসূত্র—কবিসম্মেলন। আশা করা যায় ভাষার সরলীকরণের মাধ্যমে হিন্দী কবিতা সর্বসাধারণের উপভোগ্য হোয়ে উঠবে।

সাম্প্রতিক কালের হিন্দী কবিতার গতিবিধি ও প্রয়োগাদি সম্পর্কিত আলোচনার নিতান্ত অভাব দেখা যায়। মাত্র দু’ চারটি বিশিষ্ট হিন্দী পত্রিকা এ ব্যাপারে সজাগ (ধর্মযুগ, সাপ্তাহিক হিন্দুস্থান, কাদম্বিনী)। বিচার, নামকসমীক্ষা পুস্তিকায় মাঝে মাঝেই হিন্দী কবিতা নিয়ে বলিষ্ঠ কিছু লেখা হয়-ভাবা হয়। হিন্দীর সুপরিচিত সমালোচক ও কবি শ্রীঅজিতকুমার সাম্প্রতিক হিন্দী কবিতায় দুইটি অভিনব বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার কোরেছেন যথা—১, ইন্দ্রজাল ২, হাতসাফাই। ইন্দ্রজাল অর্থে একপ্রকার টেকনিক যার মধ্যে কিছু অপ্রচলিত শব্দ ও ব্যাকরণবর্জিত প্রয়োগ দিয়ে পাঠককে হঠাৎ বিভ্রান্ত করা যায় কিন্তু কাব্যের নিহিতার্থ (বা গূঢ়ার্থ) স্পষ্টও হয় না, ব্যবহারিকও মনে হয় না। অথচ এঁরা যথার্থ ‘রেভোল্যুশনারী ফর্মে’র কবিতা লিখেছেন বোলে দাবী করেন। এরাই ‘ককুলা’ ‘বাংগুর’ ‘ঘুরকুচ’ ইত্যাদি অশ্রুত শব্দ প্রয়োগ কোরে থাকেন। হাতসাফাই পর্যায়ে যে সব কবিদের শ্রেণীবদ্ধ করা হোয়েছে তাদের কাজ তুলনায় সোজা। তারা অতিকৌশলে বিদেশী সাহিত্য কিংবা প্রতিবেশী সাহিত্য থেকে নতুন কিছু বক্তব্য ও শৈলী আয়ত্ত কোরে নিয়েছেন কিন্তু তার উপস্থাপনার ভঙ্গি মৌলিক। এইরকম কবিতার দুটি পরিচিত সংকলন হোলো—‘রাতজাগা’ (জিতেন্দ্রকুমার) ও

'আঁখ হাত বন্‌তে হয়ে' (জ্ঞানেন্দ্রপতি)। 'রাতজাগা'র এই কবিতা দুটি পরিবেশনের নৈপুণ্যের জন্য চোখে পড়ে—

'ছন্দ এখানে মেলে না তার পাখা।
(কেননা) অদূরে এক ইস্পাত তরু
ডালে তার এক কাংস্য বনমানুষ
একমনে খায় চকচকে গোল গুবরে পোকা।
কদাচিৎ নীচে অবহেলে দেখে
শোনে না কবিতা কেবল খায়।'

এবং— কি ভীষণ মৌলিক মূর্খ এই পৃথিবী !
কি ভীষণ ধূর্ত এই শকুনিরা !
(ওদিকে) মানুষেরা এমন ঘৃণ্য ও হাস্যাস্পদ হোয়ে উঠেছে
বাঁচার দায়ে সে চিরকালই যেমনটি ছিলো।"

'হাতসাফাই' পর্যায়ে এমনও কিছু কবিতা আছে যার বক্তব্য নতুন নয়, ভাব ও ভাষার কারিকুরিও নেই কিন্তু এই কবিতা আশ্চর্য এক পরিবেশ সৃষ্টি কোরতে পারে। পাঠকের সামনে যেন একটা ছবি এঁকে দেয়। প্রয়োগবাদী হিন্দী কবিরা এই ধরনের কবিতা লিখছেন :—

"একদিন ভোরবেলা হঠাৎ
আমার দেড় বছরের ছেলেটা বড় হোয়ে গেল
সে দাঁড়ালো, হাঁটলো, পা উঁচিয়ে ধরতে চাইলো দেওয়ালটা
আমি উঠে ওর হাত ধরলাম
তুলে দিলাম ছিটকিনির কাছে
কি কাণ্ড ! দেখি একটা আস্ত পৃথিবী-ই
আমার হাতে শক্ত সমর্থ হোয়ে উঠেছে" —রাজীব সক্সেনা

'হিন্দী কবিতায় অরাজকতা' প্রসঙ্গে 'বিচার' (সমীক্ষা পত্রিকা) সম্পাদক লিখেছেন আধুনিক হিন্দী কবিতার নাকি তিনটি প্রধান উপসর্গ দেখা যাচ্ছে—১. উত্তেজনামূলক সংবেদনা ২. অনাবশ্যক বাগাড়ম্বর ৩. অস্পষ্ট বক্তব্য। মন্তব্যটি নিঃসার নয়। তীব্র প্রতিক্রিয়া মাত্রই কাব্য নয়। শব্দের ঘনঘটাও কবিতা নয়, নিরর্থক কতকগুলি পংক্তি ও কাব্য নয়। কবিতা প্রয়োজনবতী না প্রয়োজনাতীত—এ একটা বিতর্কিত প্রশ্ন। একদল কবি বলেন কবিতার কোনো উদ্দেশ্য নেই, এ নিছক উপলব্ধি ও আত্মানুভূতির বিষয় (কাব্যং স্বান্তঃসুখায়)। অনেকে বলেন কবিতা চিরকালই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, তা যাই হোক্ যেহেতু পাঠক মাত্রই কবিতার অবিমিশ্র রসের অধিকারী তাই শব্দ ও ছন্দের বিন্যাসের সাথে সাথে সে নিশ্চয়ই যুগোপযোগী একটা বক্তব্য চায়। নিদেনপক্ষে কবির মনোভাব সুস্পষ্টভাবে বুঝতে চায়। সুখের বিষয় ষাটের দশকে অনেক হিন্দী কবি তাঁদের দায়িত্ব পালনে সজাগ হোয়েছেন। সতর্কতা ও সাবধানতার প্রয়োজন সবসময়ই রয়েছে, যাতে আধুনিকতার নামে সাহিত্যে অন্তঃসারশূন্য জিনিস চালাবার অপচেষ্টা না করা হয়।

লৌকিক বিধিনিষেধ

অমলেন্দু মিত্র

রকমারি বিধিনিষেধ অর্থাৎ ইংরাজীতে যাকে 'টাবু' বলা হয়, তা একমাত্র আমাদের দেশেরই বস্তু নয়। পৃথিবীর উন্নত অনুন্নত সব সমাজেই কিছু না কিছু বিধিনিষেধ কুসংস্কাররূপে বয়ে চলে আসছে। রবীন্দ্রনাথ এক সময় সখেদে লিখেছিলেন, 'যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়, পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।' কথাটি তিনি যথার্থই লিখেছিলেন। ইয়োরোপের সভ্য-সমাজে শুক্রবার এবং মাসের তেরো তারিখটি নিয়ে কুসংস্কার বর্তমান। আদিম অধিবাসীরা অবশ্য বহু প্রকার বিধিনিষেধ মেনে চলে; কিন্তু আমাদের দেশ সম্ভবতঃ এ বিষয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করতে পারে। এত বিবিধ-প্রকার বহুমুখী বিধিনিষেধের প্রাচীর আর কোথাও নেই। এসব লোকবিশ্বাস ও সংস্কার এত ব্যাপক ও জটিল যে তার তন্ন তন্ন করে জড় করা এবং মেলানো একরকম দুঃসাধ্য। শুভাশুভ নির্ণয় করার প্রথা, আজকের জিনিষ নয়। প্রখ্যাত শ্লোকটি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য—'গোবৎসা গ্রযুক্তা দক্ষিণাবর্তবহ্নি'... ইত্যাদি। খুনার ও ডাকের বচন, শুভাশুভ নির্ণয় সম্পর্কেও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। আর্যসমাজের ভিতর দিয়ে শুদ্ধিকরণের ফলে এই বিধিনিষেধগুলি এবং মৃতাশৌচ, জন্মাশৌচ প্রভৃতি বিষয়ে কৃত্যাদি পাঁজি পুঁথির পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়; ফলে সেগুলি সর্বভারতীয় কৃত্যরূপে পরিগণিত হয়েছে। আদিম অধিবাসীরাই বিভিন্ন প্রকার লোকবিশ্বাসের ধারক। তাদের কাছ থেকেও আমরা নানারকম বিশ্বাস লাভ করেছি। জেলা ও প্রদেশ অনুসারে এইসব বিধিনিষেধ নানাভাবে, নানারূপে সমাজে প্রচলিত আছে। এগুলি, কি তপশীল সমাজ, কি বর্ণ হিন্দু সকলেই সমভাবে গ্রহণ করে বসে আছে। কোনোটিকে পৃথক করে কোন্ জাতির অবদান তা নির্ণয় করার উপায় নেই। তবে এইসব সংস্কারাদি তন্ন তন্ন করে সংগ্রহ করলে একটি বিষয়ে আমরা প্রভূত উপকৃত হবো। সেটি হল লোকদেবতার স্বরূপ উদ্ঘাটন। আমাদের বিচিত্র লোকদেবতাগুলি যে প্রকৃতপক্ষে কি এবং কিভাবে তাঁদের সৃষ্টি হয়েছে তা সাফল্যজনকভাবে নির্ণয় করা আজও সম্ভব হয় নি। তার কারণ হচ্ছে, দেবতার থান (স্থান) থেকে, দেবতাদের নিয়ে তৈরী লোকসঙ্গীত থেকে, অর্বাচীন যুগের কবিদের দেবদেবী মাহাত্ম্যমূলক রচনা থেকে এবং ব্রতের ছড়া থেকে দেবতার স্বরূপ নির্ণয়ের ব্যর্থ প্রয়াসে অবতীর্ণ হওয়া। লোকদেবতাগুলিকে অজ্ঞাত বস্তু ধরে নিয়ে আমাদের জ্ঞাত-সংস্কার বিশ্বাস ও আচার আচরণ ধরে এগিয়ে যেতে হবে। এইগুলির জট খুলতে পারলেই লৌকিক দেবদেবী ও ব্রত ইত্যাদির গ্রন্থিমোচন করা সম্ভব হবে। তাই যতদূর জানা সম্ভব ততদূর পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে যেতে হবে সবরকম তথ্য সংগ্রহ করতে করতে। এই প্রবন্ধে আমি শুধুমাত্র আমাদের দেশের বহুবিচিত্র বিধিনিষেধ (খনার বচনজাতীয় বহুপ্রচলিত এবং অশৌচসংক্রান্ত পুস্তকে মুদ্রিত বিশ্বাসগুলি বাদ দিয়ে) সম্পর্কে আলোচনা করছি। আগেই বলেছি এগুলি negative magic-এর পর্যায়ে পড়ে।

জীবজন্তু ঘটিত :—বিড়াল মারলে রাজযক্ষা রোগ হয়। ষষ্ঠীর বাহন হিসাবে বিড়াল অবধ্য। ব্যাঙ মারলে পেট ফুলবে। টিকটিকি, বানর মারতে নেই। কুকুরের গায়ে জল দিতে নেই।

বানরের এঁটো খেলে কাশরোগ হয়। বিড়াল কুকুরের এঁটোও খেতে নেই। পিঁপড়ে খেলে সাঁতারে পটু হয়। শকুন পতন অশুভ। কালপ্যাঁচা বাড়ীতে বসা খারাপ। বোয়াল মাছ খেতে নেই। খলিশা মাছ খেলে রক্তকুলে জন্ম হয়। শনিবারে শোলমাছ পুড়িয়ে খেলে শনিদোষ নাশ হয়। শ্মশানে মাগুর মাছ বলি দিলে শিশুর দোষ ছাড়ে। গোরুর হাঁচি বাড়ীতে মৃত্যু ঘটার পূর্বাভাস। ভিটেতে ঘুঘু বসা উৎসন্ন যাওয়া সূচনা করে।

গোরু ও গোহাল ঃ—তেল মেখে গোহালে প্রবেশ নিষেধ। পান খেয়ে গোরুকে ছুঁতে নেই। গোয়াল পরিষ্কার করে ঈশান কোণে ময়লা জড় করা নিষিদ্ধ। অমাবস্যা শনি বা মঙ্গলবারে গোহালের গর্ত্তে মাটি দিতে নেই। শনি মঙ্গলবার দুধ ঘি বিক্রী বা দান নিষিদ্ধ।

রবিবার সম্পর্কে ঃ—রবিবারে বাঁশ বা বাঁশপাতা ছুঁতে নেই, বাঁশের জ্বর হয় (বীরভূম)। বাঁকুড়ায় এই বিশ্বাস শনিবার সম্পর্কেও প্রযোজ্য। নিষিদ্ধ ছেলে এবং চোঁড়া সাপ রবিবার বিষযুক্ত হয় বলে বিশ্বাস। ঐদিন সাপ মারতেও নেই। রবিবার মুসুর ডাল খেতে নেই। রবিবার পথ্য করা চলে না।

ফলফুল, গাছপালা সংক্রান্ত ঃ—গাছের ফুল ফোটা একটি অতি সাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় দু'একটি গাছের ফুল সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। যথা, মান গাছে যদি বাড়ীতে ফুল ধরে তাহলে সেই গৃহ নির্বংশ হয় বলে বিশ্বাস। পান, আদার চাষ, হলুদের চাষ বাড়ীর ভিতর করতে নেই। কলাগাছ, জবাফুলের গাছ বাড়ীর মধ্যে লাগানো সকলের পক্ষে সয় না। নিম, অশ্বত্থও বাড়ীতে লাগাতে নেই। এমন কি নিম, অশ্বত্থ গাছের কোনো প্রকার আসবাবপত্র তৈরী করা বা পোড়ানো নিষিদ্ধ। মিষ্টি কুমড়ো মেয়েদের কাটতে নেই। সোজাভাবে পটল চিরতে নেই। ভাদ্রমাসে লাউ খেতে নেই। ফল খেয়ে জল খেতে নেই।

মেয়েদের দিয়ে তরিতরকারী গাছ লাগালে ভালো ফসল হবে বলে বিশ্বাস। (আদিম কৃষিকার্য মেয়েদের হাতে প্রথম পত্তন হয়েছিল এবং মেয়েরা সন্তান ধারণের ক্ষমতা রাখে—এই দ্বিবিধ বিশ্বাস সংস্কারটির মধ্যে কার্যকর)। ফলন্ত গাছ কাটতে নেই। রাত্রে গাছে হাত দিতে নেই। অমাবস্যার দিন জমিতে লাঙ্গল জুড়ে চাষ করা অবিধেয়।

দক্ষিণদিক ঃ—দক্ষিণদিকটাকে যমের দুয়ার বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে যুগ যুগান্তর থেকে। রামায়ণে দশরথের মৃত্যু সম্পর্কে ভরতের স্বপ্নদর্শনে আমরা পড়ি, দশরথ গাধার পিঠে চড়ে দক্ষিণদিকে যাত্রা করেছেন। গাধা যমের বাহন। অগস্ত্যমুনি দক্ষিণে যাত্রা করেন চিরকালের জন্য। দক্ষিণদিক সম্পর্কে ভীতি সারা ভারতে বিদ্যমান। আমাদের লোকবিশ্বাসে, দক্ষিণদিক সম্পর্কে অনেক বিধি-নিষেধ রয়েছে। যেমন, পিতামাতার বর্তমানে দক্ষিণমুখে খেতে নেই। দক্ষিণ শিওরে শুতে নেই। দক্ষিণমুখে প্রদীপ, ঝাঁটা, গাড়ু বা অন্যরূপ জলযুক্ত কোন পাত্র রাখতে নেই। দক্ষিণমুখে হাঁচতে নেই দক্ষিণমুখে উনান রাখতে নেই। কুলো দক্ষিণমুখে রাখা নিষিদ্ধ। দক্ষিণমুখে ধান ঝাড়াই, মাড়াই ও মাপা নিষেধ।

বাসন ঃ—কাঁসার শব্দ করতে নেই, লক্ষ্মীছাড়া হয় এবং যতদূর শব্দ যায় ততদূর নিন্দা ছড়ায়। খাবার সময় নড়বড় করলে সে পাত্র থেকেও খেতে নেই।

দাগ ঃ—জলের দাগ কাটতে নেই, ঋণ হয়। লোহা দিয়ে দাগ কাটা চলে না। থাবার সময়ে পাতে আঙুল দিয়ে দাগকাটা নিষিদ্ধ। কয়লার দাগ কাটাও বারণ। কালি ও নখের দাগ দিতে নেই।

পৌষ এবং ভাদ্র ঃ—পৌষ এবং ভাদ্র মাসে ঝাঁটা কিনতে নেই। পৌষ মাসে ঝাঁটা লুকিয়ে রাখতে হয়; এমন কি ঝাঁট দিয়ে বাইরে ফেলা যায় না। এই মাসে রাত্রে কোনমতেই ঝাঁট দেওয়া চলে না (লক্ষ্মী মাস বলে)। পৌষ মাসে রাত্রে চাল ধুতে নেই। ভাদ্র মাসে কুকুর, বিড়াল, ঝি, চাকর কাউকে তাড়াতে নেই। পৌষের রাত্রে ভাজা কলাই খাওয়া বারণ এবং ভাত টিপে দেখতে নেই।

ঝাঁটা ঃ—কারও গায়ে ঝাঁটা লাগালে তাকে পা দিয়ে ঝাঁটাটি মাড়িয়ে দোষ কাটাতে হয়। দক্ষিণমুখে ঝাঁটা রাখলে যমের জিহ্বা বৃদ্ধি পায় বলে বিশ্বাস। কারও সঙ্গে ঝগড়া বাধাতে গেলে দুটি ঝাঁটা মুখোমুখি ঠেকিয়ে রাখতে হয়। ঝাঁটা ডিঙানোও নিষিদ্ধ। ঝাঁটার যাত্রা ভালো নয়।

শয়ন সংক্রান্ত ঃ—মানুষের শয়ন সম্পর্কেও অদ্ভুত অদ্ভুত বিশ্বাস প্রচলিত আছে। সকল প্রকার বিশ্বাস ও নিষেধাজ্ঞার কারণ নির্ণয় করা অসম্ভব। যথা শায়িত মানুষকে ডিঙিয়ে যেতে নেই। যদি ডিঙিয়ে কেউ যায়, তাকে আবার ফিরে ডিঙিয়ে আসতে হয়। শায়িত মানুষকে প্রণাম করতে নেই। শায়িত অবস্থায় একমাত্র মৃত ব্যক্তিকেই প্রণাম করা যেতে পারে। দক্ষিণ শিওরে শুতে নেই তা আগে বলেছি। পৌরাণিক কাহিনীতে আছে দক্ষিণ শিওরে শোওয়া একটি হাতির মাথা কেটে গণেশের মাথায় বসান হয়েছিল।

কান্না ও ডাক ঃ—বাড়ীতে বিড়াল কুকুরের কান্না অত্যন্ত অশুভ। অসুখ করে। শেয়াল কারও ভিটেতে দাঁড়িয়ে ডাক দিলে গৃহে মৃত্যু ঘটে। শুকনা ডালে বসে কাকের ডাকও অত্যন্ত মন্দ লক্ষণ বলে মনে করা হয়।

প্রদীপ ঃ—প্রদীপের স্থান আমাদের গৃহকর্ম, তথা মাঙ্গল্যকর্মে অপরিহার্য। দেবস্থানে প্রদীপ, প্রদীপ জালিয়ে সন্ধ্যা দেখানো, আরতি, বরণ, দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদীপ ভাসানো, দীপান্বিতা, প্রেতকে পথ দেখাবার উদ্দেশ্যে বাসিক আকাশ প্রদীপের ব্যবস্থা প্রভৃতি কত রকমই সংস্কার না আমাদের মধ্যে আছে। প্রদীপের ব্যবহার ক্রমশঃ কমে আসছে। সম্ভবত একমাত্র মাঙ্গল্য কর্ম ছাড়া প্রদীপের ব্যবহার হয় না। কিন্তু প্রদীপ নিয়েই অনেকরকম বিশ্বাস আমাদের ছিল বা আছে। আগেই বলেছি, দক্ষিণমুখে প্রদীপ জালতে নেই। প্রদীপের কোলে একটি সলতে দিতে হয়। কোলের সলতে জলে ওঠা অমঙ্গলজনক বলে বিবেচিত হয়। তাছাড়া প্রদীপ জালার সময় প্রদীপের কোলে একটি কড়ি রাখার বিধান আছে। অন্যথায় মনে করা হয়, যদি কোনো জোনাকী পোকা প্রদীপের শিখায় পুড়ে মারা যায়, তাহলে যে প্রদীপ জালিয়েছে তার অচিরে মৃত্যু ঘটবে।

পাখা ঃ—হাত পাখা পোড়াতে নেই। পাখা করার সময় কারও গায়ে পাখা ছুঁয়ে গেলে সেটিকে সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে ছোঁয়াতে হয়, নইলে সে নাকি শুকিয়ে যাবে পাখার মতো।

জোড়া পুতুল ঃ—দুটি বিবাহ সাত দিনের মধ্যে একই ছাঁদনা তলায় ঘটাতে নেই। ঘটালে দম্পতিদের একজনের মৃত্যু ঘটে। দু'জন মানুষ কাছাকাছি বসে থাকলে তাদের মধ্য দিয়ে সোজা

হয়ে পার হতে নেই। ঝুঁকে পরে একটা হাত ঝুলিয়ে মাটিতে কাল্পনিক রেখা টেনে পার হতে হয়।

বিবাহ ঃ—বিবাহ যাত্রায় বরের টোপর চালের ছাঁচে অপাবধানে ছুঁয়ে গেলে বিবাহ শুভ বলে ধরা হয়। বিবাহ করতে বসে পাত্র-পাত্রীকে গালে হাত দিয়ে ভাবতে নেই। ঋতুমতী স্ত্রীলোককে বিবাহ বাসরে থাকতে নেই। বিধবা নারীকে পাত্রে পাত্রী বরণ করতে নেই।

প্রস্রাব ঃ—দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে নেই। করলে বাপের মুখে প্রস্রাব করা হয় বলে বিশ্বাস। স্নান করতে করতে প্রস্রাব করাও নিষিদ্ধ।

মৃত্যুঘটিত ঃ—মুখাগ্নির পর অগ্নিদাতাকে পিছন ফিরে তাকাতে নেই। কুটো বা খড়কে দাঁতে কাটতে নেই কারণ খড়কের সাহায্যে মুখাগ্নি করা হয়। মৃত ব্যক্তির নাম করতে নেই। মৃতকে পরিত্যক্ত রাখতে নেই ছুঁয়ে বসে থাকতে হয়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঃ—এক চোখ বন্ধ করে কারও দিকে তাকালে ঝগড়া হয়। ছোট ছেলের মাথায় চাঁটি দিতে নেই। চাঁটি মারলে ফুঁ দিতে হয়। আধখানা পা ধুতে নেই। কাঁধে কাঁধ রেখে পথ চলা নিষিদ্ধ। উল্টো হাতে খেতে দিতে নেই। দুই নখে ঠোকাঠুকি করতে নেই। ঝগড়া হয়।

যে স্ত্রীলোকের পায়ের কড়ে আঙুল মাটি স্পর্শ করে না, তার অনিবার্য বৈধব্য যোগ আছে বলে বিশ্বাস করা হয়। রাত্রে নিজের ছায়া দর্শনে ভৌতিক জ্বর হয় বলে মনে করা হয়। চালের ছাঁচ মাথায় ছোঁয়া অমঙ্গলজনক। কাপড় বা গামছা নিংড়ানো জল গায়ে দিতে নেই। সরু কাঠি দিয়ে শিশুদের গায়ে আঘাত করতে নেই শরীর শুকিয়ে যায়। পাখার বাঁট দিয়েও মারতে নেই। কুৎসিত রোগের নাম উচ্চারণ করলে দোষ কাটাবার জন্য বাঁ কানে হাত দিতে হয়। কারও গায়ে লাথি মারতে নেই। আসন, বাসন ও দেহ বাজাতে নেই। রাত্রিতে আঙুল মটকান বারণ। অপরের শরীরে শ্বাস ফেলা নিষিদ্ধ। রাত্রে তুড়ি দেওয়া অবিধেয়। কাউকে ধরে উঠতে নেই। কোমরে পা ঠেকলে চিমটি না কাটলে অকল্যাণ হয়। উঁচু জায়গায় বসে পা দোলান বারণ। ত্রিকচ্ছ না করে এক ছোঁচ কাপড় পরতে নেই। রাত্রে হাতে বা মুখে কোন শব্দ করতে নেই। তাতে লক্ষ্মী চঞ্চলা হন। অঙ্গ নাচাতে নেই। কাপড়ের প্রান্তভাগ অন্যের গায়ে লাগাতে নেই। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে ঠেকাতে হয়।

বিবিধ ঃ—হাঁড়ির ঢাকনা খুলে রাখতে নেই (প্রেত ভয়ে)। মাছে পা ছোয়াতে নেই। আঁশ ঝুড়িতে বা মাছের জালে পা ঠেকানো নিষিদ্ধ। পানের বোঝা বাঁধা খড়ের দড়ি স্ত্রীলোক পা দিয়ে মাড়াতে পারে না। দুটি কাঠি দু' হাতে করে একসঙ্গে আগুন ধরাতে নেই। দুকাঠি একত্র বাজাতে বা পিটতে নেই। উল্টো করে শিল রাখা চলে না। শিল পেতে তার উপর নোড়া বসিয়ে রাখতে নেই। শিলভাঙ্গা অমঙ্গলজনক। চৌকাঠে বসতে নেই, নিতম্বে ঘা হয়। সন্ধ্যাবেলা বাড়ীর প্রতি চৌকাঠে জল ছড়া দিতে হয়। পিঁড়ি উল্টো করে রাখতে নেই। পিঁড়ি পোড়াতে নেই। ঢেঁকিও পোড়ান চলে না। তেল মেখে বা স্নানের পর মুখে কিছু না দিয়ে ভিক্ষান্ন দিতে নেই। ঈশান কোণে বাড়ী ফিরতে নেই। ছাগলের দড়ি ডিঙ্গানো বারণ। পশ্চিমমুখে রওনা হওয়া নিষিদ্ধ। ধানচাল মাপা হয়ে গেলে সের বা পাই ধানচালের সঙ্গে একত্র রেখে দিতে নেই। সের পাই-এ

ভিক্ষার চাল নিয়ে দিতে নেই, ভিটেতে লাঙ্গল দেওয়া চলে না। ফুঁ দিয়ে প্রদীপ নেভানো খারাপ। উনানে পা ঠেকাতে নেই। রাত্রে 'সাপ' শব্দটি উচ্চারণ করা অবিধেয়। সাপের পরিবর্তে 'লতা' বলতে হয়। অসুস্থ অবস্থায় আলতা সিঁদুর মেয়েদের পরতে নেই। ঘাটের পাথর তুলে আনলে রজককুলে জন্ম হয়। পাতের এটো নুন খাওয়া নিষেধ। পিতার পুত্রকে উত্তর দিকে মুখ করে বসে কিছু খেতে নেই। তেল মেখে টাকা পয়সা স্পর্শ করা চলে না। পূর্ণিমা, অমাবস্যা, লক্ষ্মীপূজা মঙ্গলবার ইত্যাদি দিনে কাপড় সেদ্ধ করা বা মুড়িভাজা বারণ। কম্বলের আসনে বসে তেল মাখতে নেই। বৈশাখ মাসে মাংস খাওয়া নিষেধ। পঞ্চমীতিথিতে লালাযুক্ত সবজী খাওয়া বারণ। জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্মবারে ক্ষৌরকর্ম নিষিদ্ধ। সোম, বুধ আর বৃহস্পতিবার মরাই থেকে ধান নামাতে নেই। জুতো উল্টোপাল্টা রাখা অবিধেয়। প্রণাম না করে টিন দিয়ে ধান মাপা চলে না। শনিরাজার নাম উচ্চারণ করতে নেই। গামছার জল মাটিতে পড়তে দিতে নেই। কাপড় নিংড়ানো জল মেয়েদের ডিঙ্গানো নিষিদ্ধ। চাবি ঘোরান বারণ—বিবাদ হয়। রাত্রে 'আমাকে ডেকো' বলতে নেই। নিশিতে ডেকে নিয়ে যায়। রাত্রে বাইরে থেকে কেউ ডাকলেও তিনবার ডাক না শুনে সাড়া দেওয়া অনুচিত। টিকটিকি ডাকলে 'সত্যি' কথাটি তিনবার উচ্চারণ করে কপালে বুড়ো আঙুল ছোঁয়াতে হয়। কাপড় দিয়ে মারতে নেই। মেয়েদের অপর কারও গায়ের কাপড়ের আঁচল গায়ে ঠেকানো নিষিদ্ধ। বাঁশ এবং খড় দিয়ে মারতে নেই।

তেলের যাত্রা ও কলার যাত্রা অশুভ। এঁটো বাসনের যাত্রাও খারাপ। কৌতুক করে অস্ত্র তুললে তা মাটিতে ঠেকাতে হয়। দাঁড়িয়ে জল খেতে নেই। আঁশ পেছের (ছোট ঝুড়ি) জল ডিঙ্গানো নিষিদ্ধ। আশপেছে মাথাতে চড়াতে নেই। কুলোর বাতাস গায়ে লাগানো বারণ। পানের বোঁটা, পানের পিক ডিঙ্গাতে নাই। কুলো মাথায় চড়ানো চলে না। পান উলটো করে সেজে খাওয়া খারাপ।

লোকসাহিত্যের এক দিক—গ্রাম্য 'তন্ত্রমন্ত্র'

ত্রিপুরা বসু

'লোক' কথাটির প্রকৃত অর্থসন্ধানে গলদ্‌ঘর্ম গবেষককুল অন্ততঃ একটি ব্যাপারে একমত হয়েছেন ; সেটি হোল, 'লোক' তাদেরই বলা হবে যাদের অঙ্গে সংস্কৃতির আলো পড়েনি। এই মনুষ্যসমাজের সাহিত্য লোকসাহিত্য, এদের শিল্প লোকশিল্প ইত্যাদি। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন ধারা [ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, গান, গীতিকা, প্রবাদ-প্রবচন, কথা কাহিনী ইত্যাদি] সভ্যতার আদিমতম যুগ বা তৎপূর্ববর্তীকাল থেকে নানাভাবে কখনও পরিবর্তিত বা কখনও বিবর্তিত হয়ে চলে আসছে। আজও তার সজীবতা গ্রামবাংলার প্রান্তে উপান্তে বর্তমান। বস্তুতঃ আজকের বঙ্গসংস্কৃতি এই লোক সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। আর্যরা আসার পর অনার্য ও আর্যসংস্কৃতির সমন্বয়কালে লোকসংস্কৃতি অনেকাংশে ফুলে উঠলো এমন কথা প্রত্যক্ষভাবে না বললেও পরোক্ষভাবে বলা দোষের হবে না। আর্যোপনিবেশকালে রচিত বেদ উপনিষদ ও স্মৃতিসংহিতার রচনার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকেই লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বাহক লোকসাহিত্য নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে এসেছে। এ সাহিত্য লোকপরম্পরায় সঞ্চারিত। প্রথম যুগের বেদ মানুষের মুখে মুখেই সঞ্চারিত হলেও পরবর্তীকালে তা পুঁথির রূপ লাভ করেছে। কিন্তু লোকসাহিত্য কোনদিন সে সৌভাগ্য লাভ করতে পারে নি। এখানেই নিহিত আছে তার স্বাতন্ত্র্য এবং নিজস্ব প্রকৃতি। লিখিত সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে অলিখিত লৌকিক ও মৌখিক সাহিত্য সংস্কৃতির এক তির্যক যোগাযোগ যে নেই বা ছিলো না তা নয়। তবু এদের মনন ও চিৎপ্রকর্ষ দ্বিধাখণ্ডিত। নমনীয়, সমন্বয়ধর্মী এবং স্থিতিস্থাপক এই লোকসাহিত্য আর্য সমাজের ভাবধারা কিঞ্চিৎ পুষ্ট হলেও আর্য সমাজের সম্পূর্ণ বহির্ভূত। লোকসাহিত্যের একটি শাখা হোল গ্রাম্য ওঝাদের তন্ত্রমন্ত্র। সাপে কাটা, পেঁচোয় পাওয়া, শিশুর গায়ে হাওয়া লাগা, কাঁদন পাওয়া, জলপড়া, নুনপোড়া, তেলপোড়া, ভূত বা জিন কাটান, বাণমারা, ইত্যাদির প্রয়োগ বা প্রতিকারকল্পে গ্রাম্য ওঝা বা গুণীনরা এইসব তন্ত্রমন্ত্র সহযোগে ঝাড়ফুঁক করে। একদা এগুলির সাহায্যে মনুষ্যবিশ্বাস বশতঃ (এবং মন্ত্রশক্তির প্রভাবে) রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রোগ নিরাময় হয়ে যেতো। বঙ্গদেশীয় মনুষ্যের আদিম ধর্মবিশ্বাস, ভূতপেত্নী, দৈত্য, শয়তান, টোটেম প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি, আর্য তন্ত্রমন্ত্রবাদ, প্রাচীন লোকঐতিহ্য, পরবর্তীকালের বৌদ্ধ ও জৈন তান্ত্রিকতা, সর্বোপরি অরণ্যবহুল দেশের মানুষের অলৌকিক এবং অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রতি নিষ্ঠাবোধ গ্রাম্য গুণীন বা ওঝাদের তন্ত্রমন্ত্রের প্রতি ব্যাপক প্রভাব এবং বিস্তৃতিকে ত্বরান্বিত করেছে। এই তন্ত্রবাদের সঙ্গে মিশ্রিত হোল গাছ গাছালির শক্তিধারণা বা 'দ্রব্যগুণবাদ'। একদিকে মন্ত্রসহযোগে ঝাড়ফুঁক, অপরদিকে নানা উপকারী গাছের পাতা বা শিকড়ের ছোপ্, বা প্রলেপ সাহায্য করতো রোগ নিরাময়ে। নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা এসে এ সমস্ত লোকাচারকে গ্রাস করেছে অনেকাংশে। ফলে ভালো হয়েছে কি মন্দ হয়েছে, সে বিচারের স্থান অন্যত্র। তবে গ্রামীণ লোকজীবনের সঙ্গে যাঁদের বিন্দুমাত্র পরিচিতি আছে, তাঁরা জানেন গ্রামবাংলায় বিশেষ করে মেদিনীপুর, পুরুলিয়া বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার ব্যাপক অংশে এই সমস্ত গ্রাম্য ওঝা এবং ওদের

তন্ত্রমন্ত্রের প্রভাব পূর্বাপেক্ষা কোন অংশে কম নেই। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী বাংলার শবর, আদিবাসী প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ অধ্যুষিত অঞ্চলে এই ওঝাকুল আজো পরম নিষ্ঠাসহকারে চিকিৎসকের বৃত্তি নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান। কাঁধে থাকে বড়ি-বকাল, শেকড়, ডাল, নানারকমের পাথর, সাপের মাথার মণি (?), তাবিজ, কবজ, আর বাঁশের তৈরী ঝাঁপির মধ্যে নানাধরণের সাপ। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ এবং বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলে দুটি বিখ্যাত ওঝা ঘরানা (school) আছে। ঐ সমস্ত অঞ্চলের আদিবাসী বা জংলী গুরুদের কাছ থেকে বাংলাদেশের অনেক অন্ত্যজ যুবক শিখে আসে নানা তন্ত্রমন্ত্র। আসামের দেবীতীর্থ কামরূপের কামাখ্যাদেবীর মন্দির ফেরৎ এমন অনেক মেয়ে গুণীনের অলৌকিক নানা কাজকর্মের কথা দক্ষিণবঙ্গের গ্রাম্যমানুষের মুখে শোনা যায়।

গ্রাম্য তন্ত্রমন্ত্রকে যাঁরা টিকিয়ে রেখেছেন তাঁরা মূলতঃ 'শবর' শ্রেণীর মানুষ। হান্টারের Statistical Accounts of Bengal এর বর্ণনানুসারে ১৯৫২ সালের লোকগণনা থেকে জানা যায় কেবলমাত্র মেদিনীপুর জেলাতেই শবর জাতির প্রায় ২০০০ মানুষ বাস করতেন। সাম্প্রতিক লোকগণনায় (১৯৬১) সারা পশ্চিমবঙ্গের শবরের সংখ্যা দাঁড়ায় ২১৮১ জন। ইউরোপীয় নৃতাত্ত্বিকদের বর্ণনা এবং বিবৃতি অনুসারে লম্বা মাথা, চওড়া নাক এবং ঝাঁকড়া চুল বিশিষ্ট ওঁরাও, লোধা, ভূমিক, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসীদের সঙ্গে শবর, ব্যাধ, মাল, শিকারী, কাকমারা প্রভৃতিদের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই 'শবর' সম্প্রদায়ের মানুষগুলির জীবন বড় বিচিত্র। মাদুলীও মন্ত্রের সাহায্যে গোপন রোগ ও সর্পদংশনের চিকিৎসার মাধ্যমে এদের জীবিকা নির্বাহ হয়। এছাড়া শিকার, মজুর বৃত্তিও এরা করে থাকে। এরা সাপ দেখেই তার নাম বলে দেয়। বোড়া সাপের (piper) ২৪ রকমের নাম এরা জানে—পাথরাজ, তেলতেলা, নাগ, ঘড়া লাগ, ঘোদড়্যা, দক্ষ, বোল, গোড়্যা, লুটুল্যা, ঘ্যাটা, শাঁকামুটি, মোস্থরা, ময়াল, কালা, লাল, ময়ুর পঙ্ক, হলদো, সাদা, তেঁতুলে, বালি, দোঁয়াশলা ইত্যাদি।

শুধু শবর ব্যতীত আরো কিঞ্চিদধিক অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ এই ঝাড় ফুককে উপজীব্য করে বেঁচে আছে। গ্রামে গ্রামে এক একজন। 'ওস্তাদের' শিষ্যসংখ্যাও কম নয়। পরে পরে মাহিষ্য কৈবর্ত, বাগদী, ডোম, চামার, মুচী, বাউরী, কাহার, দুলে, দামলী, শুড়ি, সুগলী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অনেক মানুষ এই সমস্ত তন্ত্রমন্ত্র শিখে নিয়ে তথাকথিত 'মানুষের উপকার' করে বেড়ায়। বিভিন্ন রোগ নিরাময়কালে এরা যে সমস্ত মন্ত্র ব্যবহার করে থাকে, কেবলমাত্র নৃতত্ত্বের দিক থেকে নয়, বাংলা ভাষার গোড়ার দিকের পরিচিতি বা অবয়বের ধারণাও এগুলি থেকে পাওয়া যেতে পারে। এই মন্ত্রগুলির উচ্চারণ বা গ্রন্থনা (এবং বানান) বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। মন্ত্রের মধ্যে মূলতঃ অনার্য দেবদেবীর নাম, বর্ণনা এবং বন্দনা পরিলক্ষিত হয়। মহাদেব-পার্বতী, ডাকিনী, যোগিনী, গন্ধর্ব, গরুড়, হনুমান, মহাবীর, মন্দোদরী, লক্ষণ, রাম, মনসা, হাড়িঝি, কামাখ্যা, কালী, তারা প্রভৃতি দেবদেবীরূপে এসমস্ত মন্ত্রে উচ্চারিত হন। শাস্ত্রকথিত দেবদেবীদের এই জাতীয় মন্ত্রে স্থানলাভের কারণটি নিঃসন্দেহে আর্য অনার্য সংস্কৃতির মিশ্রণের সূত্রটির মধ্যেই নিহিত আছে। কে বা কারা সর্ব প্রথম এই সমস্ত মন্ত্র রচনা করেছিল বা কেন করেছিল, এই সৃষ্টিকর্মের পেছনে সত্যিকার কোন দৈবপ্রভাব (মঙ্গল কাব্য রচনার ক্ষেত্রে কবিগণ যেমন দেবদেবীর আদেশ বা প্রভাবের কথা স্বীকার

করেছেন) কাজ করেছিলো কিনা এসব বিষয় নিয়ে, যতদূর জানি আজ পর্যন্ত কোন গবেষণাকার্য সম্পাদিত হয়নি। অথচ সভ্যতার প্রসার এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে ও মানুষের বিশ্বাসবোধের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য তন্ত্র মন্ত্র একটু একটু করে লোপ পেয়ে থাকে।

সর্পদংশনের প্রতিষেধক হিসাবে ওঝাদের 'আড়াইপটি ঝাড়নের' মন্ত্রটির মধ্যে একটি ছোট্ট কাহিনী বর্তমান—

'ফিঙ্গা বলে ফিঙ্গিলো হেরে দেখ রঙ্গ—
ফিঙ্গারা বাপে ঝিয়ে লেগে গেছে সঙ্গ ॥
ফিঙ্গার বচনে ফিঙ্গি পাতিলেন বিষ
ভস্ম যারে কালকুট সাপের বিষ ॥
মনসা দেবীর আজ্ঞায় রুং রাং রাং সোহায় ॥'

প্রসববেদনায় কাতর প্রসূতির প্রসব ত্বরান্বিত করতে গ্রাম্য ওঝারা 'জল পড়া' দিয়ে থাকে। জলটি পুকুর বা জলাশয় থেকে সংগ্রহ করার সময়ও কিছু কিছু নিয়মকানুন আছে। লোহার কোন অস্ত্র নিয়ে জলাশয়ের পরিষ্কার জলে বর্গক্ষেত্রাকার দাগ টেনে তার মধ্যবর্তী অংশ থেকে তিনবার পাত্রে জলভরে আনতে হয়। লোহার অস্ত্রটি ঐ পাত্রে ডোবানো থাকবে। ঐ সময় 'পেছু ডাকা' বা 'হাঁচি', টিকটিকির আওয়াজ অশুভজনক। তারপর ঐ জলপাত্রটি ওঝা হাতে নিয়ে মন্ত্রপড়ে তাতে ফুঁ দেয়। মন্ত্রটি নিম্নরূপ :—

'আমাক নড়ে পর্বতটলে, রামলক্ষণ দুই লালা
শুন কি কর থকা থুঁকি, রক্ত কুন্তলিতে বসিয়া,
বাহির হও আসিয়া ॥
গোহুটোন ও গুহদ্বার দাড়িয়া
বাহির হও আসিয়া
শ্রীগুরু কালিকাচণ্ডীর বরে শীঘ্র করিয়া ভুমিতে পড় ॥'

মন্ত্রটি আটবার উচ্চারণ করা হবে। প্রতিবারে একটি করে ফুঁ দেওয়া হবে পাত্রে; শেষবারে তিনটি ফুঁ দেওয়া হবে। জলটি এবার মন্ত্রপুতঃ হবে।

পেটের গোলমাল ও বদহজমের জন্য 'নুন পোড়া' দেওয়া হয়। 'পোড়া' অর্থে মন্ত্রপুতঃ করা। হাতে লবণ নিয়ে ওঝা মন্ত্র উচ্চারণ করে—

'নুন নুন, এ নুন কে পড়ে—গুরু পড়ে,
গুরুর আজ্ঞায় আমি পড়ি।
এ নুন পড়ায় নজর দোষ, পেটব্যথা রসকস
শিগ্রি ছেড়ে যা।
পেট কামড়ি শিগ্রি ছেড়ে যা।
কার আজ্ঞায়।
ঈশ্বর মহাদেবের আজ্ঞায়।

কাউরের কামিক্ষি দিয়েছেন বর
কার আজ্ঞায়—
সে হর পার্বতীর আজ্ঞায়।
শিগ্রি ছেড়ে যা। শিগ্রি ছেড়ে যা ॥'

শিশুরা অনেক সময় একনাগাড়ে ১ দিন/২ দিন ক্রন্দনরত থাকলে তাকে ওঝার ভাষায় 'হা—বাতাস' লাগা কান্না বলে। তার প্রতিষেধক মন্ত্রটি হোল—

'সিজ কাঠের ফটক্ ডম্বুর মাকড় বোদের ছাই।
রাত কাঁদনা দিন কাঁদন ছেলে বুধাইতে যাই ॥
ছেলে তোর মা করেছে কোলে।
না কাঁদ না কাঁদ ছেলে ॥
ঈশ্বর মহাদেব বলে কান-টু ॥'

'গা বন্দ' দেওয়ার মন্ত্রটি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন এবং তাই সহজবোধ্য এবং মার্জিত :—

'নাচ বন্দ বাট বন্দ পাতালে বাসুকি বন্দ
সগ্‌গে বন্দ ইন্দ্রাজ।
ভোলা বন্দ ভুলি বন্দ, আটকুট মস্তামস্তি বন্দ
পড় বন্দ মোর অঙ্গ জুড়ে ॥
আমার অঙ্গে যে করে ঘা—
তাকে ভক্ষণ করুক বাশুলী মা ॥
সাপা বাঘা ভুতা
তিন তালি দূর যা দূর যা দূর যা ॥

মন্ত্রটি বলে তিনবার হাতের তালি দিতে হয়। তালির আওয়াজ যতদূর যাবে ততদূরের মধ্যে মন্ত্রপাঠকের কেউ কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

সর্পদংশনের প্রতিষেধক 'ব্রহ্মবীজ' নামক কালীমন্ত্রটির মধ্যে উৎকল ভাষার প্রভাব লক্ষ্যণীয়—

'কেশ মুড়ন্তী, কেশভারন্তি, সগ্‌গেরও ধম্নি মত্তো আসন্তি
হে ধম্নি হে, অজাকে কি শাপ খাওন্তি।
অজা জ্বালাতে জ্বলন্তি, চক্ষে ধারা আসন্তি,
ওজা আসি ধন্বন্তরী, ওজা আসি ধম্নিবাঁদন্তি।
সূর্য্য দেবির আজ্ঞায় ধম্নি ওজা বাঁদন্তি।
গোড়ুর দেবীর দুহায়, রুং রাং রিং সোহায় ॥

কাঁটাছাড়িয়ে খুব সাবধানে খাওয়া সত্বেও অনেক সময় মাছের কাটা গলায় লেগে যায়। অসহ ও অস্বস্তিতে শরীর ভার বোধ হয়। ওঝা আসে, 'কাটা ঝাড়ন' মন্ত্র পাঠ করে—

'উদা খায় উদি হাঁসে (ওঁ ব্যক্তির নাম)
অঙ্গের কণ্ঠের কাঁটা খসে,'

ওঁ (নাম) এর অঙ্গের কাটা পাতালে প্রবেশ যা।

এমনি একটি আকস্মিক বিপদ 'কাকড়া বিছার দংশনে'। এরও একটি সংক্ষিপ্ত মন্ত্র আছে—

'বিছা বিছা, রাম বলেন সিজা
লক্ষ্মণ বলেন কি।
উড়িল বিছার বিষ কোকড়া দেগে দি ॥

স্ত্রীলোকের স্তনে কোন কোন সময় দুধ সঞ্চিত হয় তাতে শুরু হয় অসহ্য যন্ত্রণা। একে গ্রাম্য ভাষায় 'দুধ ধুনকি' বলে। এর ঝাড়ন মন্ত্রটি হোল—

'উপারে কুল গাছটি।
কুল খাই কুলটি বাছি ॥
তায়ে করেছে খেত কাগের বাঁসা।
কার আজ্ঞা, উগ্রচণ্ডি মা কালীর আজ্ঞা ॥
ওঁ (নাম) এর ধুনকি শীঘ্র যা ॥'

গর্ভমধ্যে সন্তান মারা গেলে সেই প্রসূতির প্রসব ত্বরান্বিত করার জন্যে 'জলপোড়া' দেওয়া হয়। তার মন্ত্রটি নিম্নরূপ—

'ওঁ বং বং ওঁ (নাম) এর গর্ভ প্রসব হউ
কুরু কুরু সাহা ॥'

ভৌতিক অপদেবতার প্রতি গ্রামীণ মানুষের এক ভীতি রয়েছে। এটি তার অন্যতম প্রাচীন সংস্কার। হিষ্টিরিয়া জাতীয় কোন রোগে শিশু আক্রান্ত হলে মানুষ ভাবে, বুঝি কোন অপদেবতা একে ভর করেছে। তাই তাকে মন্ত্র উচ্চারণ করে ঝাড়ফুঁক করা হয়—

'কাত্তিক গণেশ খেলা করে দুর্গার বাসরে,
সুন্দর দেখিয়া বালা লক্ষিল তাহারে ॥
অচেতন হইয়া বালা মুখে ভাঙ্গে লাল।
কাত্তিক উঠিয়া বলে মাগো কি হইল জঞ্জাল ॥
ধেয়ে ধেপে ধরে কাত্তিক জননীর পায়।
ওমা গণেশ কেমন করে কি হবে উপায় ॥
ঐ মুনি চলিলেন তবে শারদা ভুবনে।
যেইখানে বসে আছে দেব শূলপাণি ॥
মহাদেব উঠিয়া বলে মার ঝাঁটার বাড়ি।
ছাড়িল পাপিষ্ঠ ব্যাধি বল হরি হরি ॥'

এই সঙ্গে একটি 'সুর পাঁচালি' ও উচ্চারণ করা হয়—

'গৃহস্থের বৌড়ি জলকে যায় গলায় রসের কাঁটি।
অঙ্গ চেপে ধর পাঁচু দন্তে চাপাচাপি ॥
শুন শুন ওরে পাঁচু শুন মোর কথা।

যেই কাটা গেল রাবণের মাথা ॥
সে মুণ্ড পড়িল গিয়া কেউটার বিলে।
পেঁচা বেটা ধরে শীঘ্র গমনে হরি হরি বলে ॥

এই প্রসঙ্গে বর্ধমান জেলা থেকে সংগৃহীত একটি সুদীর্ঘ এবং সরস 'মন্ত্র' এর কথা মনে পড়ে এটিও 'ভূতছাড়ান' মন্ত্র—

'রামের আদেশে ভাই সীতা গেল বনে—।
পঞ্চমাসের গর্ভ সীতার রাম নাইক জানে ॥
লব বলে পুত্র হলো জননী জঠরে।
কুশ বলে পুত্র হলো বাল্মিকী মুনির বরে ॥
লব কুশ দুই ভাই বীর দুই জন।
যাহার যুবেতে (?) থাকেন শ্রীরামলক্ষ্মণ ॥
দেবতা কুলেতে ব্যাটা রাখিলি আকার।
তোর মা যে করেছিলো তেমনি ভাতার ॥
আঘুট দেবতাগণ মোরে দেয় ঘাঁটা।
তে কানে বলি পাঁচু গা বুড়িয়া বেটা ॥
বেটের কেশ ধরিয়া মারম ঝোঁটা।
পিট করম পাড়ু, ছাড়ড়ে চুয়েলা পাঁচু ॥
হুকুম আল্লা তোকে দোহাই খোদা।
পাঁচু ছাড় এইবার ॥'

সর্পদংশন বা কোন ক্ষতস্থানে বিষাক্ত কীটাদি দংশনের ফলে শরীরে 'মোয়া' (septic) হয়। মন্ত্রপ্রয়োগে এই 'মোয়া' ঝাড়া হয়। এই ঝাড়নকার্যে অনেক সময় 'বাকস' গাছের ডাল, বেগনে গাছের নরম পাতা বা 'আপাং' গাছের শেকড় ব্যবহৃত হয়। বস্তুতঃ উক্ত তিনটি গাছই ভেষজ বিদ্যায় উপকারী বস্তু হিসাবে স্বীকৃত। কফ বা কাশিতে 'তে-বাকস' (পাতা, ছাল ও শেকড়) সেদ্ধ করে খাওয়া, মাথার যন্ত্রণায় বেগুনের পাতার রস কপালে মর্দন এবং পুরোনো ক্ষতে আপাং শিকড়ের প্রলেপ যথেষ্ট উপকার প্রদর্শন করে বলে শোনা যায়। এই 'মোয়া' ঝাড়নের মন্ত্রটি নিম্নরূপ :—

'আস্তিক গৌতম পরাশর ঋষি (ঋষি),
এই তিনজন ধ্যানে বসি,
আস্তিক গৌতম বসলেন ধ্যানে,
মর মুয়া তুই ব্রহ্ম জ্ঞানে,
কার আজ্ঞায়,
আস্তিক গৌতমের আজ্ঞায়
ওঁং হ্রীং হ্লীং কীং এর সাহা [তবার জপ, ৫টি ফুঁক] ॥'

একটি হঠাৎ ব্যাধি মানুষকে পেয়ে বসে। এর কোন সময় অসময় নেই। কখনও বা শয়নের দোষবশতঃ, কখনও বা কোন ভারী কাজ করার সময় শরীরের কোন কোন স্থানে এক আশ্চর্য ব্যথা বা

যন্ত্রণা অনুভূত হয়। গ্রাম্য ওঝার ভাষায় একে 'সট্‌কা' লাগা বলে। এর মন্ত্রটি নিম্নরূপ :—

'উপার থেকে আবাদে বুড়ি,
কাঁদে তার শ্বশুরের ঝুড়ি (?),
কোন কোন শ্বর
সুশ্বর, কুশ্বর কুগেঁটা শ্বর (ওঁকার),
আজ্ঞে যে ব্যথা আছে, উল্টে তার বুকে পড়,
কার আজ্ঞায়, বাপ ধর্মের আজ্ঞায়
শীঘ্র ছাড় শীঘ্র ছাড় (৫ বার ফুঁ) ॥'

'সটকা' ঝাড়নের একটি সংক্ষিপ্ত বীজ মন্ত্র মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার ঘাটাল ও আরামবাগ মহকুমায় প্রচলিত আছে— 'ওঁং ত্রিং শ্রীদুর্গায়ৈ নমঃ'

উক্ত বাক্যটি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির আক্রান্ত স্থানে ওঝা একখণ্ড খড় বা 'আপাং' গাছের শেকড় দিয়ে বামহস্তদ্বারা লিখে চলবে এবং ফুঁ দিয়ে যাবে, যতক্ষণ না সটকা শরীর ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

শৃগাল, কুকুর, ধোড়া সাপ বা অন্য কোন কারণে শরীরে 'মোয়া' সৃষ্টি হলে 'থালা পড়ার' মাধ্যমে তার 'কাটান' (cure) করা হয়। মন্ত্রটি নিম্নরূপ :—

'চামুণ্ডা ভৈরবী বলে শুন মোর বাণী,
বিষ বাণ পুড়ে (ওঁ) রক্ত হোল পানি,
এই থালা পড়া লাগাই (ওঁ) এর গায়,
করে ঠাঁই ঠাঁই, কার দোঁহাই ॥'
চামুণ্ডা ভৈরবীর দোঁহাই ॥'

একটি কাঁসার থালাকে উক্তমন্ত্র বলে মন্ত্রপূতঃ করে সেটি রোগীর পিঠে বসিয়ে দেওয়া হয়। মোয়া কেটে যাবার পর থালাটি এমনি পিঠ থেকে খসে পড়ে।

কোন স্ত্রীলোককে নিজের বশে আনতে হলে 'সিঁদূর পড়া' দেওয়া হয়। এই মন্ত্রঃপূত সিঁদূর ঈপ্সিত স্ত্রীলোকের সিঁদূর কোটোয় কিছুটা মিশিয়ে দেওয়া হয় গোপনে। তারপর সেই সিঁদূর স্ত্রীলোকটি কপালে পরে এবং বশীভূত হয়ে পড়ে। বিবাহিত স্ত্রীলোককে বশীভূত করার চেষ্টা হীনমন্যতার পরিচায়ক হতে পারে। কিন্তু স্ত্রী যখন স্বামীর বশীভূত হচ্ছে না ঠিক সে সময় এই 'সিঁদূর পড়ার' যাথার্থ্য অবশ্য স্বীকার্য। মন্ত্রটি নিম্নরূপ :—

(ক) 'রক্তে রাতনি, রক্তে ভাজনি, রক্তে দুহু (দিহু) ছড়া,
(ওঁ ও নাম) কে না দেখতে পেলে হবি তিন দিনের বাসি মড়া,
কার আজ্ঞায়, নয়না যোগিণী দেবির আজ্ঞায়
সিঁদূর পড়ায় মোহিনী লাগ যা ॥'

(খ) 'ডাল নড়ে পাতা ঝড়ে ওঁকির কাঁদে,
সিন্দুর পরে হাটে বিচ্ছেদ বাটে বিচ্ছেদ।
পুকুর ঘাটে বিচ্ছেদ,

ওঁকির ওঁকাকে না দেখতে পেলে বড় বিচ্ছেদ ॥
কার আজ্ঞায় নয়না যোগিণী আঁধার দেবির আজ্ঞায়,
সিন্দুর পড়া মোহিনী লাগ যা।'

'বাতের ঝাড়ন' মন্ত্রের মধ্যে ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের ভাষা সংস্কৃতির ছাপটি লক্ষ্যণীয়—

'রক্ত মাসে জন্মিলি বাত,
ওরে ওরে বাত তুই কোন কোন জাত
এমা গেমা শির কাঠি চৌরাশী,
ওরে ওরে বাত তোকে ডাকুনস্তি,
কো ডাকুনস্তি, হাড়ি ঝি ডাকুনস্তি,
কুঙ্গো মর, কার আজ্ঞায়
হাড়ি ঝিয়ের আজ্ঞায়, কুঙ্গো মর কুঙ্গো মর।'

ওঝা যখন ডাক পেয়ে রোগীর বাড়ী চলেছে, তখন সে আগে ভাগে নিজের অঙ্গের চারিদিকে কল দিয়ে দেয়। তারপর অন্যের রোগমুক্তির জন্যে মন্ত্রাদি উচ্চারণ করেও ঝাড়ফুঁক করে। একে গুণীনি ভাষায় 'চলন বন্দ' বলে— 'ঘাট চালনং পথ চালনং চালং বনের বাগ,
তেমথা চাহির মেমথা সকল কাঠিয়া
করিলাম থান থান।
রাম লক্ষ্মণ পিছে দৌড়ায় কালি দৌড়ায় আগে,
সোনার খাটে চড়িলাম।
দিলাম শত্রু গলে ফাঁকা,—আদাড়ে ধর্মরাজ
সঙ্গে সঙ্গে ফিরে, সব ঘুরে সব মরে,
পিয়াল, ছিয়াল, কাঙাল হয় যারে।'

'জলভরণের' মাধ্যমে চোর, দুষ্কৃতকারী বা অপরাধকারী ব্যক্তির মুখ দেখা যায়। পরিশ্রুত জলের মধ্যে ভেসে ওঠে তার মুখ। তাই পূর্বেই এই জলটিকে মন্ত্রঃপূত করা হয় নিম্নের মন্ত্রটি দ্বারা—

'একে পুড়ুং এক, দুয়ে পুড়ুং দ্বিতীয়ার চাঁদ,
তিনে পুড়ুং তিনথান পৃথিবীর,
চারে পুড়ুং চৌতি ভুজ নারায়ণ,
পাঁচে পুড়ুং পাঁচ ভাই পাণ্ডব,
ছয়ে পুড়ুং গঙ্গা,
সাতে পুড়ুং সাতালি পর্বত,
আটে পুড়ুং আটকুঁড়া নাগ,
নয়ে পুড়ুং নয় ভুজ,
দশে পুড়ুং দশমুণ্ড রাবণ,
এগার পুড়ুং এগার যোজন,

বার পুড়ুং বারই বাসদেব,
তের পুড়ুং তেরই উল্লুক ঘাট'

এই সঙ্গে চলে এক সুদীর্ঘ মন্ত্র পাঠ। 'পুড়ুং' শব্দের অর্থ কোন অভিধানে মেলে না।

'কোন কোন দেবতাশয় মোর জলদর্পণের ঘা—
পাতালে পুড়ুং পাতাল কামারি
উনপঞ্চাশকোটি নাগালয়ে অয় বিষহরি।
ঝোড় ঝঞ্ঝায় পুড়ুং যত আছে নদী
তেমাথায় পুড়ুং অন্ন নরপতি,
মড়ার শ্মশানে পুড়ুং গগন্দ বীর হনুমান
লাউ বানা পুই পাতা লাউ (লাউ) বলিদান।
উনকোটি নিকং পুড়ুং শান্ত সরিশিব।
নাড়ের ঘোরণী পুড়ুং কালিকা ভূসতি,
শ্রীরাম লক্ষণ পুড়ু লক্ষী সরস্বতী।
হরের ঘোরনী পুড়ুং গৌরী পার্বতী।
ডানা ডাকিনী পুড়ুং গঙ্গা দুই ছাড়—
পড়ান্তর পুড়িতে এড়াতে নেই ভিট্।
গৈলের (গোয়াল) গোমর পুড়ুং পাকুড়ের ডলি
লও বানা পুইপাতা লও (লাউ) বলিদান
কে আছ (ওঁনাম) অঙ্গের বলে দাও নাম।"

এমন কত শত শত তন্ত্র মন্ত্র ছড়িয়ে রয়েছে গ্রাম বাংলার ওঝাদের এবং শিষ্যগণের মুখে মুখে। কোন লেখালেখির বালাই নেই। হাতে 'তামা তুলসী' দিয়ে দিব্য করে গুরু শিষ্যকে শিখিয়ে দেয় মন্ত্র।

মানুষের আদিম ধর্মবিশ্বাস একদা বৃহৎবঙ্গের মানুষকে এসমস্ত তন্ত্র মন্ত্রের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছিল। চিকিৎসাবিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধিত হলেও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগে গ্রামবাংলার মানুষ সর্পদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য ওঝাকেই ডাকে।

বৎসরের বিভিন্ন সময়ে মনসাপূজা বা এজাতীয় নানা পর্ব উপলক্ষে এই ওঝা সম্প্রদায়দের দেখা যায় বিভিন্ন বিষধর সাপ-খেলা দেখিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে। অরণ্যবহুল বাংলার মানুষ এই সর্প-দেবতার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। সে হিসাবে ওঝাদের কদরও নেহাৎ কম নেই।

নির্দেশিকা ॥ Statistical Accounts of Bengal-Hunter, মেদিনীপুর জেলা ইতিহাস ও সংস্কৃতি, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—আশুতোষ ভট্টাচার্য্য। Races of Man-Haddon,

মন্ত্রগুলি মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে গৃহীত। কয়েকটি মন্ত্রের সংগ্রাহক শ্রীগৌরচন্দ্র দাস।

তুহফত দর্পণে রামমোহন মানস

গোরাচাঁদ মিত্র

মধ্যযুগীয় কুসংস্কার প্রধান হিন্দুধর্মকে মানবমুখীন করার বিরাট সংগ্রামে রাজা রামমোহন রায় ছিলেন সম্পূর্ণ একা। দেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ রক্ষণশীল মনোভাব আঁকড়ে ধরে তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন, দু'বার তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টাও হয়েছিল। দেশবাসীও তাঁর কার্যপ্রণালীকে সেদিন সমর্থন জানাননি। কিন্তু অবিচলিত রামমোহন আধুনিক চিন্তাধারার সওয়ারী হয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে গিয়েছেন—জ্ঞানাঞ্জন শলাকা স্পর্শে আমাদের অজ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত করার মানসে। আধুনিক ভারতবর্ষে যুক্তিবাদের প্রথম প্রবক্তা রামমোহনের জীবনী অনুধ্যানে কোন উপকথা, কিংবদন্তীর আশ্রয় না নিয়ে শুধুমাত্র তথ্যগতভাবে ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখি—তাঁর মধ্যে যে ধর্মীয় বিপ্লব-চেতনা পুঞ্জীভূত ছিল তার প্রথম বিস্ফোরণ ঘটে ১৮০৩-৪ সালে, পিতার মৃত্যুর ঠিক পরেই। এই সময় তিনি পারসী ভাষায় রচনা করলেন 'তুহফত-উল-মুয়াহিদ্দীন' নামে একটি ছোট্ট পুস্তিকা। 'তুহফত-উল-মুয়াহিদ্দীন' শব্দের অর্থ একেশ্বরবাদীদের উপহার। তাঁর বয়স তখন প্রায় তিরিশ। পিতার মৃত্যুর পর রামমোহন পৃথকভাবে কলকাতায় তাঁর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। এই অনুমান বোধ করি অসংগত হবে না যে পিতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের বিভিন্ন আচার সর্বস্ব কর্মকাণ্ড রামমোহনকে গভীরভাবে বিচলিত করেছিল এবং তারই ফলস্বরূপ 'তুহফত' প্রকাশ। 'তুহফত' প্রকাশের আগে রামমোহন বিক্ষিপ্তভাবে দু' একবার কলকাতা যাতায়াত করলেও, স্থায়ীভাবে নগরবাসী হন ১৮১৫ সালে। কাজেই কলকাতার মাধ্যমে বাইরের পৃথিবীর সম্যক পরিচয় লাভের সৌভাগ্য তাঁর তখনও হয়নি। সংস্কৃত, পারসী ও আরবী ভাষায় ততদিনে তাঁর যথেষ্ট অধিকার জন্মালেও, ইংরেজী জ্ঞান অতি সীমিত। যুক্তিবাদী মানসিকতা গঠনের এই সামান্যতম সুযোগের সদ্ব্যবহার করে রামমোহনের মানুষ ও ঈশ্বর সম্পর্কীয় পুস্তিকা রচনা, সেদিনের মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে আগতপ্রায় নবজাগরণের উষাকাল সূচিত করেছিল।

তুহফত রচনাকালে রামমোহনের আবাসস্থল ছিল মুর্শিদাবাদে। মূল গ্রন্থটি পারসী ভাষায় রচিত হলেও, ভূমিকা আরবী ভাষায় লেখা। বইটির প্রথম ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ সালে। অনুবাদক মৌলভী ওবেদউল্লা। ১৯৪৯ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস তুহফতের বাংলা অনুবাদ প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এর আগে চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকার পৃষ্ঠায় সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত তুহফতের বাংলা অনুবাদ করেন। তুহফতে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী একজন মুক্তমন মানুষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে রামমোহন জগতের স্রষ্টা পাতা সংহর্তা সেই পরমেশ্বর ও পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মমত বিচার বিশ্লেষণ করে সত্য নির্ণয়ের ভার নিয়েছেন। এই পুস্তিকা রচনায় কোন শাস্ত্র-ভাবনাই তাঁর মনে স্থান পায়নি। এক্ষেত্রে তিনি পুরোপুরি র‍্যাশনালিষ্ট। এই জগতের পরমেশ্বরকে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই বিশ্বাস করে। তাঁর প্রতি রামমোহনেরও ছিল অবিচল বিশ্বাস। সকলে কিন্তু 'সেই সত্তার বিশেষ বিশেষ স্বরূপ লক্ষণ ও ধর্মের বিভিন্ন মত ও বিচিত্র ব্যবস্থা সম্বন্ধে একমত নন'।

প্রত্যেক সম্প্রদায়ই নিজের মতকে এবিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করেন। তাঁদের যুক্তি—আমার পূর্ব-পুরুষরা এরকম বলে গেছেন। রামমোহনের জিজ্ঞাসা—তাঁদের পূর্বপুরুষরাও যে ভুল বলেননি তারই বা স্থিরতা কোথায়? সমস্ত ধর্মমতকে যেমন অবলেপায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না, তেমনি কোন একটি ধর্মমতকেও অভ্রান্ত বলে স্বীকার করে নেওয়া যায় না। এই ভুল-ভ্রান্তির আবিলতা থেকে শাশ্বত সত্য নির্ণয়ই মনুষ্যত্বের পরম ধর্ম। এবং এই সত্যাসত্য নির্ণয়ে রামমোহন প্রচেষ্টার স্বাক্ষর 'তুহফত-উল-মুয়াহিদীন'।

তুহফত গ্রন্থে রামমোহন প্রথম আক্রমণ হেনেছেন ধর্মগুরুদের প্রতি। তাঁর বিচারে এঁরা ভণ্ড-প্রতারক। ঈশ্বরের নামে এঁরা মানুষের মনে বিভিন্ন কুসংস্কার গোঁড়ামি প্রবিষ্ট করানোয় সিদ্ধহস্ত। আপন স্বার্থের খাতিরে ধর্মগুরুরা মনভোলানো ভাষায় অলৌকিকতার আবরণে বিশুদ্ধ সত্যগুলি ঢেকে রাখেন। কেউ এর প্রতিবাদ জানালে হয় তাকে শূলে চড়ানো হয় নতুবা বাক্যবাণে জর্জরিত করা হয়। (রামমোহন পরবর্তী জীবনে এই উক্তির সাক্ষ্য মেলে)। সাধারণ মানুষ এই ধর্মগুরুদের আকর্ষণী মায়ায় দৃষ্টির স্বচ্ছতা হারিয়ে ফেলেন। ইট, কাঠ, পাথর, জন্তু-জানোয়ার—সব কিছুই তাঁরা প্রকৃত উপাস্য দেবতা বলে মনে করেন। এর জন্য তাঁরা নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত। কোরাণের বাণী উদ্ধৃত করে রামমোহন তাই ঈশ্বরের শরণাপন্ন—'আমাদের নিকৃষ্ট সত্তার এই সব প্রলোভন ও দুষ্কর্মজনিত অপরাধ হতে রক্ষা পাবার জন্য ঈশ্বরের শরণ মাগি'। শৈশব থেকে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিপালিত হওয়ার দরুণ সেই সম্প্রদায়ের ধর্মমতকেই চিরন্তন সত্য বলে মনে করে। রামমোহন জানতেন মানুষের ধর্মবিশ্বাস দু'টি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমতঃ—'আত্মার বর্তমানতার সত্যতার উপর', দ্বিতীয়তঃ—পরকালের উপর, 'যে পরকাল দেহমুক্ত আত্মার সুকৃতি দুষ্কৃতির দণ্ড পুরস্কারের স্থল'। কিন্তু এ দু'টি বিশ্বাসের সঙ্গে লেজুড় হিসেবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে হাজারো রকম সামাজিক বিধিনিষেধ। রামমোহনের মতে এই বিধিনিষেধগুলোই সামাজিক উন্নতির প্রধান অন্তরায়। তাঁর বিশ্বাস মানুষ নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে সহজেই সত্যাসত্য নির্ণয় করতে পারবে—বাহ্যিক মোড়কে আকৃষ্ট না হয়ে পরব্রহ্মকে জানতে আপ্রাণ চেষ্টা করবে এবং সমাজের কল্যাণে নিজেকে নিঃস্বার্থভাবে উৎসর্গ করবে। (রামমোহন পরবর্তীকালে হিন্দুধর্ম সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন সমাজ-কল্যাণের প্রেরণায়)। প্রত্যেক ধর্ম দাবী করে অন্যমতাবলম্বী হলে অশেষ কষ্ট ভোগ করতে হবে এবং তা মৃত্যুর পর। ইহকালে এ উক্তির সত্যতা যাচাই করা সম্ভব নয়, কারণ পরলোকের ওপার থেকে সাক্ষ্য দিতে কেউ অবতীর্ণ হননি বা হচ্ছেন না। কিন্তু মানুষ যে ধর্মাবলম্বীই হোক না কেন ইহলোকে 'জ্যোতিষ্মণ্ডলীর আলোক, বসন্তের আনন্দ, বর্ষার বৃষ্টিধারা, শারীরিক স্বাস্থ্য ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, দেহ ও মনের সৌন্দর্য প্রভৃতি স্বর্গীয় আশীর্বাদ' যেমন সে ভোগ করছে, তেমনি 'অসুবিধা, যন্ত্রণা, অন্ধকার ও শীতের প্রকোপ, মানসিক ব্যাধি, আর্থিক দৈন্য, দেহ ও মনের বিকৃতি' ইত্যাদি তাকে সহ্য করতে হচ্ছে। কোন সম্প্রদায়ই বিশেষ সুবিধাভোগী হতে পারেন না। ধর্মগুরু প্রসঙ্গে রামমোহনের অভিমত আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ফরাসীদেশের এনসাইক্লোপিডিষ্ট বা বিশ্বকোষপ্রণেতাদের মতামতকে।

তৎকালীন ভারতবর্ষে অলৌকিক বা অতি প্রাকৃত বস্তুতে মানুষের অকম্পিত বিশ্বাস বিষয়ে

রামমোহন তুহফত গ্রন্থে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বোঝাতে চেষ্টা করেছেন অলৌকিকত্ব বলে কিছু নেই। স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবের জন্যই আমরা আশ্চর্যজনক কিছু দেখলেই তার উপর অলৌকিকত্ব আরোপ করি। অবশ্য গভীর অনুসন্ধিৎসার পরও কোন কোন ক্ষেত্রে সেই ঘটনার ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় না। রামমোহনের মতে সেক্ষেত্রে আমাদের বোধশক্তির বর্তমান অক্ষমতাই দায়ী। অভিজ্ঞতাবিরুদ্ধ কোন ঘটনা বিশ্বাস করা উচিত নয়। সাংসারিক ক্ষেত্রে মানুষ দুটি ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ খুঁজলেও ধর্মের ক্ষেত্রে সম্পর্কহীন দুটি ঘটনার একটিকে কারণ ও অন্যটিকে কার্য বলে স্বীকার করতে সে দ্বিধা বোধ করে না। উদাহরণস্বরূপ—কোন ব্যক্তি অসুস্থ। তার আত্মীয় স্বজন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন সেই ব্যক্তিকে সুস্থ করে তোলার আশায়। দেখা গেল, লোকটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল। এ ক্ষেত্রে উভয় ঘটনার মধ্যে কোন কার্য কারণ সম্পর্ক নেই। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার জন্যই লোকটি সুস্থ হয়েছে যুক্তিবাদী মন এ সিদ্ধান্ত কখনই মেনে নেবে না। সাধারণ মানুষ যদিও বা রহস্য অনুসন্ধানে ব্যপৃত হন, ধর্মগুরুরা এমন ভাবে ব্যাখ্যা করেন যে ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারে যুক্তিতর্কের স্থান নেই, বিশ্বাস ও ঈশ্বরের কৃপাই একমাত্র নির্ভর'। অনেকে এইরকম যুক্তি প্রদর্শনে ইচ্ছুক যে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান সুতরাং মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার তাঁর পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। এইমত স্বীকার করলে তর্কশাস্ত্রের মূল ভিত্তিই নষ্ট হয়ে যায়, কারণ সম্ভব ও অসম্ভবের মধ্যে তখন কোন ফারাক থাকবে না। রামমোহনের যুক্তি কিন্তু এখানেই নিঃশেষিত নয়। তাঁর মতে পরমেশ্বরও অসম্ভব কিছু সৃষ্টি করতে পারেন না। তাঁর প্রশ্ন—পরমেশ্বর কি আরেকজন ঈশ্বর সৃষ্টি করতে পারেন? তিনি কি আত্মবিনাশ করতে পারেন? অথবা চিরবিরুদ্ধ মতের ঐক্যকরণ করতে পারেন? সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরও অসম্ভব কিছু সম্ভব করতে পারেন না। এ ক্ষেত্রে মতাজেলা সম্প্রদায়ের দর্শনের সঙ্গে রামমোহন মতের সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। অলৌকিকত্বের সমর্থক অনেকের আর একটি বহুল প্রচারিত যুক্তি—প্রাচীন রাজাদের সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীতে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা কিভাবে অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে প্রচলিত কিংবদন্তীকে অবিশ্বাস করেন? রামমোহনের বক্তব্য ঐতিহাসিক কিংবদন্তী যুক্তিবিরুদ্ধ ও পরস্পরবিরোধী হলে তাও অবশ্যই পরিত্যাজ্য। কিন্তু কোন রাজার সিংহাসন আরোহন, শত্রুবিনাশ সাধন—এ সকল ঘটনা যুক্তিবিরুদ্ধ নয়, পরস্পরবিরোধীও নয়। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে কিংবদন্তীগুলি যুক্তিবিরুদ্ধ ও পরস্পরবিরোধী। বৌদ্ধগ্রীষ্টের জন্মবিষয়ে খৃষ্টান অভিমতের (ভাজিন বার্থ) প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে রামমোহন লিখছেন প্রাণীর জন্ম পিতামাতা থেকে, কিন্তু 'বাপ মা ছাড়া সন্তানের জন্মলাভ সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ'। আলেকজাণ্ডারের জন্ম ও চীন বিজয় সম্পর্কে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত থাকলেও পারস্য ও গ্রীক ঐতিহাসিকেরা এ ঘটনা সমর্থন করেন না। তাই ঐতিহাসিক কিংবদন্তী হলেও তা বর্জনীয়। ঐতিহাসিক ঘটনার প্রমাণ সম্বন্ধে রামমোহনের এই সিদ্ধান্ত আমাদের বিস্মিত করে। রামমোহনের অন্যতম জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় এই বিস্ময়বোধের কারণ—'জর্মানদেশীয় ঐতিহাসিক পণ্ডিত নিবুর ঐতিহাসিক সমালোচনার (Historical Criticism) সৃষ্টিকর্তা। তিনি রোমদেশীয় পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় ঘটনা সকল এইরূপে পরীক্ষা করিয়া উহার আদি বিবরণের অধিকাংশই অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। ইংল্যাণ্ডে আর্ণলড, লিউইস প্রভৃতি ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিতগণ নিবুরের

শিষ্য ও প্রতিদ্বন্দ্বী। স্যার জর্জ কর্ণওয়াল লিউইস ঐতিহাসিক ঘটনার প্রমাণ বিষয়ে (on the canons of Historic Credibility) একখানি গ্রন্থ লিখেন। রাজা নিবুরের অল্পদিন পরে এবং আর্নল্ড ও লিউইসের পূর্বে যেরূপ ভাবে এ বিষয়ের বিচার করিয়াছেন, তাহা যথার্থই আশ্চর্য্য। রাজা জর্মাণ ভাষা জানিতেন না। তাঁহার সময়ে নিবুরের গ্রন্থ ইংরেজীতে অনুবাদিত হয় নাই। অথচ ঐতিহাসিক ঘটনার প্রমাণ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রতিভা ও মৌলিকত্বই প্রকাশ পাইতেছে'।

পৃথিবীতে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে মতপার্থক্য প্রসঙ্গে অনেকে বলেন, প্রাচীন কালের রাজাদের প্রবর্তিত আইনের সঙ্গে এ কালের আইনের যেমন প্রভেদ, বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে প্রভেদও এই দৃষ্টিতে দেখা উচিত। এ উক্তির বিরুদ্ধে রামমোহনের প্রথম জবাব রাজায় ও ঈশ্বরে তুলনা হতে পারে না। ডঃ কালিদাস নাগ তুহফতের বাংলা অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন—'এই বাক্যে মনে হয় যেন Milton বা Montesquie-দের গভীর অভিজ্ঞতা রামমোহনের ভাষায় ঝংকৃত হয়ে উঠেছে'। তুলনা না হওয়ার কারণ 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পাশে যে মানুষের জ্ঞান অসম্পূর্ণ, যে মানুষ সকল কাজের পরিণতি জানতে অক্ষম, যার ভুল-ভ্রান্তি হবার সম্ভাবনা অনেক, যার কাজে স্বার্থপরতা, প্রতারণা বা ভণ্ডামী রয়েছে, তার তুলনা করাই চলে না'। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন ধর্মমতের বিধানগুলি পরস্পর বিরোধী। ব্রাহ্মণরা মনে করেন 'তাঁরা ঈশ্বরের কাছ থেকে অমোঘ আদেশ পেয়েছেন যে তাঁরাই সব ক্রিয়াকলাপ বরাবর করে যাবেন এবং তাঁরাই ধর্মকে চিরকাল ধরে রাখবেন'। অন্যদিকে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা মনে করেন পবিত্র কোরাণ অহুসারে 'পৌত্তলিকদের বধ করা ও তাদের নানাভাবে নির্যাতন করা ঈশ্বরাদেশে অবশ্য কর্তব্য'। কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে এই বিরুদ্ধ মতের উপদেশ বা আদেশ দেওয়া কখনই সম্ভব নয়। এ সবই ধর্মান্ধদের মনগড়া কাহিনী। তাই সবসময় মানুষকে সত্য উদ্ঘাটনে সচেষ্ট হতে হবে। সত্য কি সংখ্যা গরিষ্ঠ মতামতের উপর নির্ভরশীল? কখনই নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ থেকেই সমর্থন করুক না কেন সত্য চির অম্লান—ভাস্বর। সমগ্র তুহফতে রামমোহন এই সত্যকে খুঁজে বেড়িয়েছেন এবং পেয়েছেনও। পৃথিবীতে প্রচলিত সমস্ত ধর্মের তুলনামূলক বিশ্লেষণে নিয়োজিত হয়ে তুহফত রচনার প্রায় অন্তিম লগ্নে রামমোহন এই সত্যে উপনীত হয়েছেন—'সর্বশক্তিমান একমাত্র ঈশ্বর বিশ্বাসই প্রত্যেক ধর্মের মূলসূত্র'। এবং সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের নিকট গ্রহণীয় একমাত্র বিশুদ্ধ পূজা—'জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষের হৃদয় পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও ভালবাসা দিয়ে জয় করা'। পরবর্তীকালে ও রামমোহন কণ্ঠে এই একই ধ্বনি অনুরণিত হয়েছে—'The true way to serve God is to do good to man'। বহু বিদগ্ধ প্রাবন্ধিকের মতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে প্রথম হিউম্যানিষ্ট। কিন্তু সম্যকভাবে তুহফত আলোচনার পর আধুনিক ভারতবর্ষের প্রথম হিউম্যানিষ্ট রাজা রামমোহন রায় এ কথা স্বীকার করতে বাধা কোথায়? অবশ্য রামমোহন মানুষকে ঈশ্বরের উপরে স্থান দেন নি নিশ্চয়। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস পোষণের দরুণই রামমোহনের নাম তথাকথিত হিউম্যানিষ্ট গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ছাড়পত্র পাবে না—এ মতের যাঁরা সমর্থক তাঁদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপিত করা নিশ্চয় অন্যায় হবে না যে তাঁরা সর্বদাই পাশ্চাত্য মতবাদের মাপকাঠিতে পূর্ববর্তী স্বদেশী মহাত্মাদের মূল্যায়ণে ইচ্ছুক।

তুহফতের উপসংহার পর্যায়ে রামমোহন পাশ্চাত্য দার্শনিক ভল্‌তেয়ার ও ভল্‌নির মত মানবজাতিকে চারভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমত—প্রতারক, যারা অপরকে নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত করার জন্য 'নানা মতবাদ, ধর্মমত ও বিশ্বাস প্রভৃতির নিয়ে প্রচার করে'। দ্বিতীয়তঃ—প্রতারিত, যারা সত্যাসত্য বিচার না করে অন্য সম্প্রদায় ভুক্ত হয়। তৃতীয় সম্প্রদায়—প্রতারক ও প্রতারিত, তারা সহজেই অন্যের মতে বিশ্বাস করে এবং অপরকেও আপন সম্প্রদায় ভুক্ত করতে চায়। চতুর্থ সম্প্রদায় ঈশ্বরের ইচ্ছায় প্রতারক বা প্রতারিত, কোনটাই নয়। তুহফত-এর শেষে হাফেজের বয়ান উদ্ধৃত করে বিশ্বমানবের প্রতি রামমোহনের আহ্বান—আমাদের আদর্শ হোক—'কারো অনিষ্টের চেষ্টা করো না, আর যা খুশী তাই কর। কারণ অন্যের অনিষ্ট করা ভিন্ন আমাদের কাছে আর কোন পাপ নেই'।

বর্তমান পর্যায়ে আলোচ্য বিষয় তুহফত-রচনায় রামমোহনের যে মানসিকতা সক্রিয় ছিল সেই মানসিকতা গঠনে কতটুকু পারিপার্শ্বিক সহায়তা তিনি লাভ করেছিলেন। তুহফত অধ্যয়নে আমাদের প্রথমেই চোখে পড়ে তাঁর অন্তরে শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিবাদের প্রাচুর্য। রামমোহন এই অস্ত্রের আঘাতে বধ করতে চেয়েছিলেন মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যবর্তী 'ইণ্টারমিডিয়েড এজেন্সী' ধর্মগুরুদের। মানুষের মন থেকে দূর করতে চেয়েছিলেন অলৌকিকত্বের প্রতি অহেতুক মোহ। প্রচার করতে চেয়েছেন একেশ্বরবাদ—সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়, পরন্তু তত্ত্বের ভিত্তিতে। তাঁর অন্তরে একেশ্বরবাদ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হিন্দুধর্মের বেদান্ত উপনিষদ এবং মুসলমান ধর্মের কোরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র পাঠে। কিন্তু ধর্মগুরুদের অস্বীকার ও অলৌকিকত্বের প্রতি তিনি খড়্গহস্ত হয়েছিলেন খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে উদ্ভূত মতাজেলা ও মুওয়াহিদ্দীন সম্প্রদায়ের শাস্ত্র পাঠের দরুণ। পরবর্তী জীবনে ধর্মীয় বিতর্কে রত রামমোহন কিন্তু যুক্তির সঙ্গে শাস্ত্রকেও সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। অবশ্য তাঁর কাছে শাস্ত্রের ততটুকু অংশই গ্রহণীয় ছিল, যা যুক্তিগ্রাহ্য।

তুহফত-উল-মুয়াহিদ্দীন গ্রন্থে 'ধর্মগুরু' বলতে রামমোহন কি যীশু বা মহম্মদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন? বোধহয় নয়। কারণ যীশু বা মহম্মদের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার পরিচয় পরের অধ্যায়ে মেলে। তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য ছিলেন গুরু, ফাদার ও মৌলভী সম্প্রদায়। তুহফত গ্রন্থে যুক্তিবাদী পাশ্চাত্য দর্শনের স্পষ্ট ছাপ আমাদের চোখে পড়লেও, আরবী ও পারসী ভাষার মাধ্যমে রামমোহন এই দর্শনের সঙ্গে কতটুকু পরিচিত হয়েছিলেন তা নির্ণয় করা সম্ভবপর নয়। পাশ্চাত্য দর্শনের সঙ্গে তাঁর পরিচিতি ছিল, এ সিদ্ধান্ত দ্বারা হয়তো আমরা তাঁর বিরাট প্রতিভার অবমূল্যায়ণ করছি—হয়তো তাঁর যুক্তির মৌলিকত্বকে খর্ব করছি, হয়তো লক, হিউম, ভলতেয়ার, ভলনি প্রভৃতি মনীষীদের চিন্তাধারা তাঁর অপরিচিত ছিল। যাই হোক না কেন, অস্বীকার করার উপায় নেই তুহফত-উল-মুয়াহিদ্দীন গ্রন্থের মাধ্যমে রাজা রামমোহন রায় সমগ্র পৃথিবীতে প্রথম সকল ধর্মের তুলনামূলক বিশ্লেষণে ব্যাপৃত হন। এটিই মানবসভ্যতার ইতিহাসে রামমোহনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।

সুরের কবি নজরুল

অমলকুমার মিত্র

সক্রিয় জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে নজরুল ছিলেন ঐকান্তিক সংগীতানুরাগী। সংগীতচর্চার পৃথক কোন অধ্যায় তাঁর জীবনে চিহ্নিত করা যায় না—গান শোনা, গান গাওয়া এবং গান বাঁধা একই সংগে বাল্যকাল থেকেই সুরু হয়েছিল। পরবর্তীকালে সেই ভাবেই সুরের মর্মগ্রহণ এবং নিজস্ব সংগীত রচনা একযোগে বহু বিচিত্র পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। এই পদ্ধতিতেই অর্থাৎ সংগীতের খণ্ড খণ্ড যোগসূত্র সম্বল করেই বাংলা গানের সৃজনকর্মে নজরুল সবচেয়ে কৃতিমান হয়েছেন। সুরকার নজরুলই সবচেয়ে সৃষ্টিশীল, মূলতঃ তিনি সুরেরই কবি। সুরের বিচিত্র পথে পথে বিচরণ করেই তিনি বাংলা-গানে যাবতীয় সম্ভাবনার ফুলগুলি ফুটিয়ে তুলেছেন। নিছক কাব্যসৃষ্টির চেয়ে সুরসৃষ্টির সাধনাতেই তিনি অধিক তৃপ্তি পেয়েছেন বলে বলে মনে হয় কারণ তাঁর কবিতার সংখ্যার চেয়ে গানের সংখ্যা অন্তত দশবারোগুণ বেশী। সুর নানারূপে মনে মনে গুঞ্জন তুলেছে, গীতিকারের ভূমিকায় তিনি সেই সুরগুলি কথা দিয়ে বেঁধে ফেলেছেন। সুরছাড়া কবিতা লেখা উত্তরকালে নজরুল প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন আর সেকথা প্রকাশ্যে ঘোষণাও করেছিলেন—আমি বর্তমানে সাহিত্যের সেবা থেকে অবসর গ্রহণ করে সংগীতের প্রশান্ত সাগর দ্বীপে স্বেচ্ছায় নির্বাসন-দণ্ড গ্রহণ করেছি·· ···(১৯৩৬, ফরিদপুর ছাত্র সম্মিলনীতে ভাষণ)।

কত গান যে নজরুল রচনা করেছেন তার অবশ্য সঠিক হিসাব এখনও পাওয়া যায়নি। তবু সে যে একটা বিস্ময়কর প্রাচুর্য এতে সন্দেহ করার কিছুমাত্র কারণ নেই। এ সম্পর্কে নজরুলের সংগীত জীবনের নিকট আত্মীয় শ্রীজগৎ ঘটক মহাশয় লিখেছেন·····'তাঁর সাথী ছিল একটা চামড়ার ব্যাগ—যেখানে যেতেন সংগে নিয়ে যেতেন। থাকতো তার মধ্যে ড্রাফট খাতা। যখন যেখানে বসে লিখতেন—বার করতেন সেই খাতা। বাড়ী এসে প্রয়োজন মত পরিষ্কার করে লিখে রাখতেন ফেয়ার খাতায়। সীতানাথ রোড, হরি ঘোষ ষ্ট্রিট এবং পরে শ্যামবাজার ষ্ট্রিট পর্যন্ত খাতাগুলো এসেছিল জানি কারণ সব খাতারই হিসাব ছিল আমার কাছে। তাতে কেবল গান আর—গানে ভর্তি। খাতাগুলো মোটা মোটা একসাইজ বুক সাইজের—ধরা যাক প্রত্যেক খাতার পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় চারশো। এরকম ফেয়ার খাতাই ছিল দশবারখানা। যদি দশখানাই ধরা যায় তাহলে প্রায় চার হাজার গান থাকবার কথা। এ ছাড়া রফ খাতায় অনেক গান লেখা পড়ে থাকে, সেগুলো আর ফেয়ার করার অবকাশ থাকে না, হয়ও না। সুতরাং পাঁচ হাজার গান অনুমান করাটা কিছু অন্যায় হবে না।'

এ তো শুধু গান রচনা নয়, বলা যায় বাংলা গানের এক বিপুল আকার এন্‌সাইক্লোপিডিয়া রচনা করা, যার প্রতি পৃষ্ঠায় নতুন সৃষ্টির স্বাক্ষর কেবলমাত্র একজনেরই। শুধু কথার পর কথা সাজিয়ে নয়, সুরের সাথে কথা সাজিয়েই রচিত হয়েছে এই বিপুল সৃষ্টি, সুরেই স্রোতেই এত কথার কলি ভেসে এসেছে। এত গানের উদ্ভাবন যে সুরের দিক থেকেই আয়োজিত হয়েছে অর্থাৎ

সুরবিহারী নজরুল সুরময় সত্তাকে প্রকাশের জন্য গীতিকার হিসাবে বিস্তৃত হয়েছেন, একথা আজও অনেকে স্বীকার করে উঠতে পারেন নি। নজরুলের খ্যাতি বিদ্রোহী কবি হিসাবেই সর্বাধিক এবং কবি হলেই গানের বাণী রচনা যেন কবিকৃত্যের অন্তর্গত স্বাভাবিক নন্দনবিলাস এমন ধরণের প্রত্যয় সাধারণভাবে প্রচলিত। ব্যাপারটা যে সেরকম নয় সেটা আরেকটু বিস্তৃততাবে আলোচনা করা যাক।

সুরই যে নজরুলের গান রচনার প্রাথমিক অবলম্বন সেটা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। 'প্রথমে গুণ গুণ করে একটা সুর জাগতো মনে। ঠিক ভ্রমর গুঞ্জনের মতো। তারপর যেন জোয়ার জাগতো ছন্দে আর মিলে। দেখতে দেখতে খাতার ওপর একটি নিটোল কবিতা রূপলাভ করতো। কিন্তু সেটা কবিতা নয়। আস্ত একটি গান।' (অখিল নিয়োগী)

আরেকটি বিবরণ প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত মহাশয়ের লেখা থেকে দেওয়া যাক, এর থেকে নজরুলের গানের কথা সংযোজন পদ্ধতি ভাল রকম বোঝা যাবে। টেবিল বাজিয়ে বা উরুত চাপরে গুণ গুণ করে ভাজতেন গানের পদগুলি, তারপর সবটা তৈরী হয়ে গেলে গাইতেন গলা ছেড়ে। আর তখনই কাগজ কলম নিয়ে লিখে ফেলতেন গানটি। লিখতে দেরী হয়ে গেলে হয়ত দুএক কলি ভুলে যেতেন। তার ফলে গানটিকে অনেক সময় আর খাড়াই করতে পারতেন না। হতাশ হয়ে বলতেন—যাঃ পালাল। এই পলাতক গানের কলি নিয়েই একদিন বেঁধে ফেললেন এক গান—পালাল, পালাল, ধর আমার চপল গানের পরী। আর একদিন ফরমাস এসেছে কীর্তন বাঁধতে হবে। মনে সুরও এসেছে। গলায় কিন্তু কথা আসেনি তখনো। ইতিমধ্যে হাজির হয়েছি আমি। সংগে সংগে গেয়ে উঠলেন—চির আনন্দে নন্দিত, ওগো নন্দগোপাল·····'

যদি প্রশ্ন ওঠে যে এই জাতীয় বাণীরচনার লঘুপদ্ধতি গ্রামোফোন কোম্পানীর ফরমায়েসী গানের বেলাতেই প্রযোজ্য হতে পারে, নিজস্ব প্রেরণাজাত গানে এরকম ঘটবে না নিশ্চয়, তবে নজরুলের অন্যান্য গানগুলির মধ্যে এই ধরনের লক্ষণ কিছু আছে কিনা খোঁজ করা যেতে পারে। একেবারে শাস্ত্রীয়সংগীত অনুসরণে যে সব গান নজরুল সৃষ্টি করেছেন সেগুলির মধ্যে নিজস্বভাব, সতর্কতা ও নিষ্ঠার অভাব ঘটবেনা বলেই বিবেচনা করা যেতে পারে। এই ধরনের গানেও যে সব লক্ষণ আছে তাতে কষ্টকল্পনা না করেই অনুমান করা যায় যে কোন সূত্রে রাগ রাগিণীর রূপটি যখন নজরুলের মনে ধরা পড়েছে, তখন সেই রূপটি বা অনুভবটুকু ফুটিয়ে তোলার আধার হিসাবে তিনি গানের বাণীটি ধ্যান লোকে সন্ধান করছেন। কথার বিন্যাস করার সময় সেই রাগ বা রাগিণীর চিন্তা তাঁর মনে এতই প্রবল হয়ে উঠেছে যে, সচেতন ভাবে অথবা অজ্ঞাতসারে, সেই রাগের নামটিও অনেক সময় গানের বাক্যাংশে আশ্রয় নিয়েছে, ভাব প্রকাশের সহায়করূপে গানের বাণীতে মিশে গেছে। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। নিচের লাইন গুলিতে বাঁদিকে রাগের নাম আর ডানদিকে গানের প্রথম কলি সাজান হল :

নীলাম্বরী—নীলাম্বরী শাড়ি পরে নীল যমুনায় কে যায়।

পরজ—পরজনমে দেখা হবে প্রিয়··

পটমঞ্জরী—আমি পথমঞ্জরী ফুটেছি আধার রাতে···

বসন্ত মুখারী—বসন্ত মুখর আজি…

শ্যাম কল্যাণ—রসঘন শ্যাম কল্যাণ সুন্দর…

সিন্ধু—বেদনার সিন্ধু মন্থন শেষ…

দেশ গৌড়—দেশ গৌড় বিজয়ে চলে…

দরবারী টোড়ী—উদার অম্বর দরবারে তোরই প্রশান্ত…

প্রদীপকী—প্রদীপ কি জ্বলিল আবার…

গৌরী রাগ অবলম্বনে নজরুল দুটি গান লিখেছেন, দুটি গানের বাণীতেই গৌরী এসেছে পৌরাণিকতাৎপর্যে। প্রথম গানটির কথা হল :

শিব অনুরাগিণী গৌরী জাগে…

আর দ্বিতীয় গানটির কথা হল : তাপসিনী গৌরী কাঁদে বেলা শেষে…

প্রথম গানটিতে ভৈরব ঠাটের গৌরী ব্যবহার করা হয়েছে, সেইজন্য 'শিব অনুরাগিণী' শব্দ বিন্যাস লক্ষণীয়। দ্বিতীয় গানটিতে পূরবী ঠাটের গৌরী লাগান হয়েছে সেইজন্য হয়ত সন্ধিক্ষণের ইংগিতে 'কাঁদে বেলা শেষে' বর্ণিত হয়েছে। নজরুলের এই জনপ্রিয় গানটি কে না শুনেছেন :

কাবেরী নদীজলে কে গো বালিকা…।

এই গানটিতে বেছে বেছে কাবেরী নদী এল কেন? গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, নর্মদা—এত নদী থাকতে বিশেষ করে কাবেরী নির্বাচিত হয়েছে হয়ত এই কারণে যে এই গানটি দক্ষিণ ভারতীয় কর্ণাটী সাবন্ত্ রাগে পরিকল্পিত, কাবেরীও দক্ষিণ ভারতের নদী তাই এর কথাই নজরুলের মনে এসেছে সুরের ঠিকানার তাৎপর্যে।

নারায়ণী রাগে নজরুল গান রচনা করলেন—নারায়ণী উমা খেলে হেসে হেসে…। এই গানে রাগের নামটি কাব্যাংশে এমন ভাবে এসে গিয়েছে যে গানের কথায় মনে হচ্ছে উমা অর্থাৎ মহাদেবের ভাবী স্ত্রী আর নারায়ণের স্ত্রী নারায়ণী যেন একই, অথবা 'নারায়ণী' যেন উমারই বিশেষণ। প্রথম লাইনের পরে আর কোথাও 'নারায়ণী' কথাটি নেই, উমার কথাই বর্ণনা করা হয়েছে প্রাঞ্জলভাবে।

একটি গানে নজরুল লাল রঙের এক বিরল জাতীয় হাঁসকে দূতী করলেন :

বল রাঙা হংসদূতী তার বারতা…

এই রাঙা হাঁসটির উৎপত্তি নিশ্চয় এ গানের রাগটির নাম থেকে হয়েছে রাগের নাম রক্তহংস সারং। আরেকটি গানে নজরুল কল্পনা করছেন সুপ্ত আগ্নেয়গিরি থেকে অকস্মাৎ অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়ে অশুভ শক্তি প্রলয়কারী এক দহনকার্য সাধিত হচ্ছে :

অগ্নিগিরি ঘুমন্ত উঠিল জাগিয়া
বহ্নি রাগে দিগন্ত গেলরে রাঙিয়া
…লঙ্কাদহন হোমাগ্নি সাগ্নিক মন্ত্র
যজ্ঞধূম বেদ ওঙ্কার ছাইল অনন্ত…

অনুমান করা যেতে পারে যে এ গানের রাগের নামটি ধ্যান করতে করতে এই বাণী রচিত হয়েছে—রাগের নাম লঙ্কদহন সারং।

রাগের নাম হেমকল্যাণ—এক কল্যাণ কামনায় রচিত হল গান :

দাও সহ দাও ধৈর্য হে উদার নাথ—দাও প্রাণ
দাও অমৃত মৃতজনে দাও ভীত-চিত জনে
শক্তি অপরিমাণ—হে সর্বশক্তিমান…

শুধু নাম কেন, রাগের বৈশিষ্ট্য ধ্যান করেও নজরুল গান বেঁধেছেন। ভৈরবী ঠাটের ধানশ্রী একটি এমন ধরণের রাগ যাতে সন্ধিক্ষণের এক বিশেষ রূপ পরিস্ফুট হয়, সকাল বেলার সুর যেন সন্ধ্যার সুরে মিশে যায়। সন্ধ্যায় যখন আলো ক্রমশ ম্লান হয়ে আসে তখন ভোরবেলার সেই আলো-আঁধার রূপটির একবার পুনরাবৃত্তি হয়, তারপরেই অন্ধকার নেমে আসে। ভৈরবী ঠাটের ধানশ্রীতে যে গান নজরুল বেঁধেছেন, তাতে এই সন্ধিক্ষণের বর্ণনাই বিধৃত :

সন্ধ্যামালতী যবে ফুলবনে ঝুরে,
কে আসি বাজালে বাঁশী ভৈরব সুরে
সাঁঝের পূর্ণ চাঁদে অরুণ ভাবিয়া
পাপিয়া প্রভাতী সুরে উঠিল গাহিয়া
ভোরের কমল ভেবে সাঁঝের শাপ্‌লা ফুলে
গুঞ্জরে ভ্রমর ঘুরে ঘুরে।
বিকালের বিষাদে ঢাকা ছিল বনভূমি
সকালের মল্লিকা ফুটাইলে তুমি
রাঙিল উষার রঙে গোধুলি লগন
শোনালে আশার বাণী বিরহ বিধুরে॥

রাগ রাগিণী সেতার বা সরোদে বাজাবার সময় যে সুরময় ঝংকার উৎপন্ন হয় সেই ধ্বনির অনুরূপ শব্দ চয়নে গান বাঁধতেও নজরুল এগিয়েছেন। শুদ্ধ সারং রাগে তাঁর একটি গান কি অদ্ভুত রুক্ষধরণের কথা দিয়ে শুরু হচ্ছে : ধুলি পিঙ্গল জটাজুট মেলে, আমার প্রলয় সুন্দর এলে। অথচ কি মনোহর ভংগিতে সেতারের বা সরোদের মীড়ভরা ঝংকার এই আপাত রুক্ষকথাগুলিতে ভর করতে পারছে গানটি শুনলেই বোঝা যায়। সুরের সেই বিশেষ ভংগিটি ধরবার জন্যই ঐ শব্দ চয়ন। এর পরই গানের সুরটি এস্রাজের মত গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে আর কথার নির্বাচনও মোলায়েম হয়ে গেছে—পথে পথে ঝরা কুসুম ছড়ায়ে, রিক্ত শাখায় কিশলয় জড়ায়ে……ইত্যাদি। সেতারের সুরভংগিতে নজরুলের আরো গান আছে যেমন : বেণুকা ও কে বাজায় মহুয়া বনে; পায়েলা বোলে রিনিঝিনি; রুম্‌ঝুম্, রুমাঝুম কে বাজায় জল ঝুমঝুমি—ইত্যাদি।

উচ্চাংগ সংগীতের ধারাটি সাধারণত রক্ষণশীল। রাগ রাগিণীর রূপায়ন নানাবিধ জটিল নিয়মের নিয়মে বাঁধা। আবার এই বাধা নিষেধের চৌহদ্দির মধ্যে সৃষ্টির কারুকার্য অজস্র কৌশলের সম্ভাবনাযুক্ত। সংগীত সৃষ্টির পরিণতি কালে রবীন্দ্রনাথ বললেন—'যদি মধ্যমের স্থলে পঞ্চম দিলে ভাল শুনায় আর তাহাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করে তবে জয়জয়ন্তী বাঁচুন আর মরুন আমি পঞ্চমকেই বহাল রাখিব না কেন? এই দৃষ্টি ভংগিতে রাগ রাগিণীর শুদ্ধাচারগুলি নানা অনুভবের রঙে রসে

সৌরভে মিলে মিশে রবীন্দ্রসংগীতে একাকার হয়ে গেল, তাদের পৃথক অস্তিত্ব রইল না। অপরপক্ষে ঐতিহ্যসূত্রের বন্ধনেই নজরুলের পক্ষপাত গড়ে উঠল কেননা সুরচিন্তার পরিণতিতে এসে নজরুল বললেন —"কোন রাগ বা রাগিণীর সঙ্গে অন্য রাগ বা রাগিণীর মিশ্রণ ঘটাতে হলে সংগীত শাস্ত্রে যে সূক্ষ্ম জ্ঞান বা রসবোধের প্রয়োজন তার অভাব আজকালকার অধিকাংশ গানের সুরের মধ্যেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং ঠিক এই কারণেই আমার নতুন রাগ রাগিণী সৃষ্টির এবং অপ্রচলিত রাগ রাগিণী উদ্ধারের প্রচেষ্টা। রাগ রাগিণী যদি তার গ্রহ ও ন্যাস এবং বাদী বিবাদী ও সংবাদী মেনে নিয়ে সেই রাস্তায় চলে তাহলে কখনও সুরের সামঞ্জস্যের অভাব বোধ হবে না।" সুতরাং একথা হয়ত বলা যায় যে সংগীত সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথই বিদ্রোহী, নজরুল নন! যদি তাল এবং মাত্রা বিভাগের দিকটি বিশ্লেষণ করা যায় তবে দেখা যায় রবীন্দ্রসংগীতে লয়কারীর কোন ইংগিত নেই; সমে গুরুত্ব নেই, গানের কথা সুর ও ছন্দ একসাথে মিলে মিশে চলেছে; তালের নিজস্ব কোন চাতুরী একেবারেই বাহুল্য, শাস্ত্রীয় সংগীতের ধারা এরকম নয়, সেখানে লয়কারীতে রসসৃষ্টির যথেষ্ট সমাদর আছে। নজরুলও ঐতিহ্য অনুসারী সৃষ্টির পক্ষপাতি। তাঁর গানে আড়ি ঝোঁক, সম থেকে সমে আসতে অসমান গতি বিন্যাস, প্রথম তাল, ফাঁক বা তৃতীয় তালের এক মাত্রা, দুমাত্রা, এমনকি তিন মাত্রা ছেড়ে তৃতালী গানে ধরতাই, সম কথায় না ফেলে সুরের অবকাশে ফেলা, গমক দিয়ে সুরু করে মীড় দিয়ে ফিরে আসা ইত্যাদি নানাবিধ প্রক্রিয়ার মজা বার বার উপভোগ করা যায় যা তবলা সংগতেও ফূর্তি এনে দেয়।

যে সব গানকে লাইট ক্ল্যাসিক্যাল পর্যায়ে ধরা হয় সেগুলিতে গানের চালটাই আসল রস। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে উর্দু বা হিন্দি ঠুংরি, গজল, দাদরা, কাজরী, চৈতী, লাউনি, কাওয়ালি, হোরী ইত্যাদি নানাবিধ রীতিতে যে টেকনিক প্রচলিত আছে নজরুল সেগুলি আশ্চর্য দক্ষতায় বাংলা গানে উপস্থিত করেছেন ঐ চালগুলি বাঁধবার মত কথার কাঠামো নির্মাণ করে। সুরের ভারে বাংলা কথায় যেখানে সেখানে ঝোঁক দিয়ে বা বেয়াড়াভাবে উচ্চারণ করে বা বোলতান দিয়ে দীর্ঘায়িত করে হিন্দুস্থানী কায়দা প্রয়োগ করলে বাংলা গান কৃত্রিম হয়ে যায়, সুরের প্রক্ষিপ্ত রূপটি পীড়া দেয়। সুরের চালটি কথার মধ্যে সাবলীল ভাবে জমিয়ে দেওয়া তখনই সার্থক হয় যখন সেই সুরের অনুভূতিই উপযুক্ত কথার কলি বেছে নিতে পারে। বাংলা গানে প্রত্যেক বিশিষ্ট সুরভংগির জন্যই নিজস্ব ধরনের ভাষা প্রয়োজন হয়, ভাটিয়ালীর সুর কীর্তনের ভাষায় বসে না, ঝুমুরের সুর শ্যামাসংগীতের ভাষায় চলে না। তেমনি অতি পরিপাটি মননশীল কথার বিন্যাস ঠুংরি, দাদরা বা গজলের চাল সুবিধা হয় না। কারণ সুরকে খেলাতে গেলেই কথার আবেদন বা ব্যঞ্জনা ক্ষুন্ন হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। যেমন কল্পনা করা যাক নিচের এই সব কবিতায় ঠুংরি দাদরার চাল প্রয়োগ করা হচ্ছে;

চুল তার কবেকার বিদিশার নিশা
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য……জীবনানন্দ।
কটাক্ষ ইক্ষণ তার হৃদয়ের বিশল্যকরণী……মোহিতলাল।
গলিত নখ পৃথিবীতে আমরা রেখে যাবো
সংক্রামক স্বাস্থ্যের উল্লাস……সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

একটু ভাবলেই বোঝা যায়, এটা অসম্ভব। কবিতা আর গান এক বস্তু নয়। গানের ভাষা

আলাদা। নজরুলের সেই বোধ প্রথর ছিল বলেই সবরকম স্টাইলের সুরকে ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি যথোপযুক্ত বাণী রচনা করে নিয়েছেন, গানের কবিতাকে সফিস্‌টিকেটেড করতে গিয়ে সুরকে হোঁচট খাওয়াননি। রবীন্দ্র সংগীতে কথা আর সুর অবিচ্ছেদ্য মেলবন্ধনে আবদ্ধ থাকে, কেউ কাউকে ছাপিয়ে যায় না সেইজন্য রবীন্দ্রসংগীত রবীন্দ্র সংগীত-ই। অন্য কোন গীতিরীতির স্ফুরণ সেখানে সম্ভব হয় নি। আর নজরুলের গানে যাবতীয় সাংগীতিক ঐতিহ্য বিকশিত হয়ে উঠেছে। গানের বাণীকেও নজরুল সাধ্যমত মনোহর করেছেন বৈকি, কিন্তু সুরকে ছাপিয়ে গিয়ে নয়। বরং সুরই ছাপিয়ে গেছে কোথাও কোথাও। যেমন সেই বিখ্যাত মার্চ সংগীতের কথা হল:

টলমল টলমল পদভরে বীরদল চলে সমরে…।

এতে বলতে চাওয়া হয়েছে বীরসৈনিকদের রণাঙ্গনে পদর্পণে এগিয়ে চলার পদক্ষেপে আশপাশ টলমল করে কেঁপে উঠছে। কিন্তু বলা হয়েছে 'টলমল টলমল পদভরে বীরদল চলে'। টলমল করে চলে ত শিশু বা নেশাগ্রস্ত মানুষ! আসলে ব্যাণ্ড বাজিয়ে সৈন্যদের মার্চ করে চলার সামরিক ব্যক্তিত্বটুকু সুরে ও ছন্দে এত জীবন্ত হয়ে উঠেছে এই গানে যে সুর দিয়েই প্রকৃত ছবি বোঝান হয়ে গেছে। নজরুলের বিদ্রোহের এবং দেশাত্মবোধক উদ্দীপনার গানগুলির কথা আশ্চর্যরকম প্রচারধর্মী। যেন শ্লোগান দেবার মত মুক্তাক্ষর এবং ব্যঞ্জনবর্ণে সুরের ছন্দ গড়ে তোলা হয়েছে। যেমন: কারার ঐ লৌহকপাট, ভেঙে ফেল কররে লোপাট—জাতের নামে বজ্জাতি সব জাল জালিয়াৎ খেলছ জুয়া—আমরা শক্তি আমরা বল—অগ্রপথিক হে সেনাদল—মোরা ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম···ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানটির যে সুরভংগি সেটাই মোটামুটি নজরুলের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু গানের সুরে বর্তমান কিন্তু কথার বেলায় দুর্গম, কান্তার, দুস্তর, লংঘিতে, যাত্রী, কাণ্ডারী ইত্যাদি শব্দের ঝোঁকে সুরের ও ভঙ্গীরূপটি আরো দৃঢ় হয়েছে এবং গানের আবেদন একেবারে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।

নজরুলের সামান্য কিছু গানে সমসাময়িক অন্য দুচারজন সুরকারও সুর দিয়েছেন। সেটা রেকর্ড করার বা অন্যের প্রয়োজনে ঘটেছে, নজরুলের সুরে যাতিতে পড়ার জন্য আদৌ নয়। প্রত্যেক গান রচনার সময়েই তাঁর সুরের অবলম্বন কিছু থাকতো, সেটা অন্য গায়কের কণ্ঠে তুলে দেবার বা সংরক্ষণ করার সময় না পেয়ে অন্য সুরকারকে দু'পাঁচটা গানের বাণী ছেড়ে দিয়ে থাকবেন। রবীন্দ্রনাথের গানও ত সেকালে কিছু বিখ্যাত শিল্পী নিজেদের সুরে গাইতেন যেমন যদুভট্ট, গহরজান মানদাসুন্দরী, পিয়ারা সাহেব, ইন্দুবালা ইত্যাদি। এজন্য কি রবীন্দ্রনাথের বা নজরুলের অবদান কম পড়ে যায়?

মানভূমের কথ্যশব্দার্থ

রামশঙ্কর চৌধুরী

ঘ

ঘা—ক্ষত।

ঘাঁটা—গোরুর খাদ্য। নানা শাক-সব্জী চাল ইত্যাদি সিদ্ধ করে তৈরী খাদ্য।

ঘাট—মৃতাশৌচের শেষ দিন।

ঘাটে উঠা—মৃতাশৌচের শেষ দিনে ক্ষৌর কর্মের পর স্নান করে নূতন পরিধেয় পরে উঠে আসা।

ঘাট লৌকিকতা বা ঘাট লোকিতা—মৃতাশৌচের পর ঘাট থেকে মৃতের পুত্র ও আত্মীয় একজন হরিনাম সংকীর্তন করতে করতে এগিয়ে আসার সময় মৃতের কুটুম্বগণ তাঁদের সাধ্যমত আর্থিক সাহায্য করেন।

ঘুগি—বিশেষ ঘাসের তৈরী মাছ ধরার জন্য সরু মুখ হাত দুই লম্বা এক ধরণের আটক, মাছ ধরার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ঘুঁপা—জাতি বিশেষ। এরা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে।

চ

চ—চল্।

চা—চা।

চালি—খড়ের ছাউনি স্থান।

চাম্—চামড়া।

চ্যালা—মাঝে চিরে দিয়ে দুটো অংশ করে দেওয়া।

চৈৎ—চৈত্র মাস।

চপসা—আলোনা।

চ্যাং—জিয়ানো মাছ

চ্যাং দলা—দুজনে পায়ে আর মাথায় ধরে তুলে নিয়ে যাওয়া।

চ্যাকা—টক

চাকা-চাকা—গোল গোল।

চিঁগুড়ি—চিংড়ি

চিবান—তামাক পাতা

চরকটা—পা দিয়ে মাড়ান

চাল সিদ্ধা—ফ্যান ভাত।

চোর খুপড়ি—কোঁঠা বাড়ীতে সিড়ির নীচের ছোট্ট ঘড়।

চাপড়া—হাত দিয়ে থাপড়ান, এক এক কদাল মাটি।

চাপত্—এর ভিতর ধোঁৎলা থাকে। গাড়ীর অংশ বিশেষ।

চিংনি—হারিকেন।

চ্যাদ—গোরুকে খড় দেওয়ার বিশেষ জায়গা।

চপা—তর্ক করা।

ছ

ছা—বাচ্চা, ছেলে

ছই—পাঁচাল তৈরীর জন্য কাদার এক একটা ডেলা

ছামড়া—বিয়ের সময়ের ডাল পালা দিয়ে তৈরী প্যাণ্ডেল।

ছ্যাচা—কোনো শক্ত পদার্থ দিয়ে ক্রমাগত আঘাত করা।

ছুলা—চামড়া উঠে যাওয়ার অবস্থা।

ছামুতে—সামনে।

ছাঁচকল—চালের কিনারা

ছাতু—ব্যাঙের ছাতা।

ছুচ—গোবর দিয়ে নিকানো।

ছপ ছপি—পর্যাপ্ত,

ছিঃ ছাতুর—ছড়িয়ে থাকা

ছৈ ছত্তর—এলো মেলো ভাবে ছড়িয়ে থাকা।

ছাপিত—গোপন।

ছাঁচি তৈল—সরষের তেল।

ছাঁচি পান—গন্ধ যুক্ত পান পাতা।

ছিলা—ছেলে।

ছিলকা—চাল গুড়ি বা কলাই এর তৈরী সরু চুকলী জাতীয় খাদ্য।

ছ্যাঁকা—চালের গুড়ির রুটির মত সাইজের খাদ্য।

ছুয়াচ—অশুচি

ছুয়াচ পড়া—অশুচি হওয়া

ছুতা—অছিলা

ছুতা হাঁড়ী—অশৌচের জন্য যে হাঁড়ী ফেলে দেওয়া হয়।

ছুচরা—লোভী

ছুচল বচল—সর্বত্র লভ্য

ছ্যাচড়া—যে কোনো মতেই জিদ ছাড়ে না।

ছিচ কাঁদুনা—যে একটুতেই কেঁদে দেয়

ছুচা—শৌচ করা

ছ্যাঁদা—ছিদ্র।

ছ্যাঁড়া—ছিন্ন।

ছৈতা—ছ হাত কাপড়।

ছুচের লাতা—মেঝেতে গোবর দেবার ল্যাতা।

ছুট্—ছোট।

ছাঁদা—ভোজনের পর পরিবারের জন্য যে সাহায্য দেওয়া হয়; গোরুর দুটি পায়ে দড়ির বাঁধন।

ছানি—চোখের মণির উপর সাদা আস্তরণ, গোরুর খাবারের জন্য টুকরো টুকরো করে যে খণ্ড কয়টা হয়।

ছাওয়া—ছাদন করা।

ছ্যোড়া—ছড়ান (ক্রি)

জ

জা—ভাসুর বা দেবরের স্ত্রী।

জাড়—শীত।

জাড়কাল—শীতকাল

জুড়ি—ঠাকুর থানে খিচুরি বা পায়েস ভোগ, স্নায়, এক বয়সের মানুষ, যাত্রা গানে গায়কের দল

জোড়—অনুরূপ অন্যটি, বয়াল বা জলাশয় হতে নির্গত জলস্রোত যা ছোট নদীতে পরিণত হয়।

জোরোলি—বাড়ী সংলগ্ন জলাশয়।

জামাই—জামাতা।

জোড় কুপড়ি—বিয়ের সময় ব্যবহৃত দুটি জল ভর্তি কলসী। বিয়ের দিন দুটি সধবা মেয়ে।

জো-ইড়ু—অশ্বত্থ গাছ।

জোল—লঘাকৃতি উনোন। এক সঙ্গে আট দশটি হাঁড়িতে ভাত হয়।

জৌল—প্যাকেট (বড়)

জোড় হাঁড়ি—বিয়ের দিন কনের ঘরে যে মিষ্টির হাড়ী পাঠান হয়

জো—উপায়।

জোছা—জ্যোৎস্না।

জান মাছ—কুচো চিংড়ি।

জনার—ভুট্টা।
জেব বা জ্যাব—পকেট।
জুয়াল—জোয়াল।
জুয়া খেলা—বিয়ের পর দিন বর কনে ও সধবা মেয়েরা নূতন জামাইএর সঙ্গে জুয়া খেলে।
জাবট্—দ্বিতীয় চাষ।
জোত—জোয়ানের সাথে যুক্ত থাকা দড়ি বিশেষ।
জীউ—জীবন।

ঝ

ঝুপান—ঠাকুরের ভর করা।
ঝুলঝুলি—ভেরি ভেরি।
ঝাড়—বংশ।
ঝোড়ালি—বৃষ্টি ও ঝড়।
ঝাঁজ—তীব্রতা।
ঝাঁটি—সরু লিকলিকে লম্বা কাঠ।
ঝ্যাটাম্—ঝাঁটি দিয়ে ঘরের চালকে গঠন করা।
ঝড়া—ধানের চাড়ার মত গাছ বিশেষ। মাটি বইবার বস্তু।
ঝুলান—ঝুলিয়ে রাখা।

ট

টে—লো বা গো
টাড়—বৃক্ষ হীন দীর্ঘ অনুর্বর জমি।
টকা—খেজুর বা তাল পাতার তৈরী সরু মুখ ডালা
টাটর—গোরুর গাড়ীর বাঁশের ছিলার তৈরী চাল।
টহল—ঘুরে বেড়ানো। কার্তিক মাসে বৈষ্ণব গ্রামের রাস্তায় সন্ধ্যায় নাম সংকীর্তন করে যায়।
টাল—আঘাত
ট্যারা—বাঁকা।
ট্যাডা—কুয়ো থেকে সেচের উদ্দেশ্যে জল তুলার বিশেষ পদ্ধতি।
টালা—চড় সারা। সময় পার করে দেওয়া।
টোল—বালতি, সংস্কৃত শিক্ষার বিদ্যালয়।
টুসু—পৌষ মাসে চাষীদের উৎসব। এই উৎসব এক মাস ব্যাপী চলে। মেয়েরা একটি মালসায় তুষ ভর্তি করে তার উপর ফুল দিয়ে টুসু বানায়।
টং—হাড়ীকে উল্টো করে তৈরী পায়রার বাসা।
টুই—শীর্ষ দেশ।
টুকচা—একটু।
টুগহু—একটু
টাড়—কুচুরি বাঁধবার জন্য ব্যবহৃত লাঠি।
টাঙ্গি—এক প্রকার অস্ত্র
ট্যাটা—এক প্রকার অস্ত্র যার তিনটি ফলা।
টাঠি—মাটির অতি ছোট পাত্র, ভাঁড়।
টিলা—মাটির স্তূপ।
টেপ—আঁচলের অংশ।

সমালোচনা

লোথাল অ্যাণ্ড ইণ্ডাস সিভিলাইজেশন ॥ **শিকারীপুর রঙ্গনাথ রাও,** মর্টিমার হুইলার লিখিত ভূমিকা সহ, এশিয়া পাবলিশিং হাউস, বম্বে, ১৯৭৩ ॥ পৃঃ ২১৫, আর্টপ্লেট ৪৩, রেখাচিত্রাদি, ৪১ ॥ মূল্য ১২০·০০ টাকা ॥

সিন্ধু সভ্যতার কথা আজও আমাদের আকৃষ্ট করে। গত তিন সময়ে এই সভ্যতার কেন্দ্র ভারত উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে। এইসব নতুন জানতে পারা কেন্দ্র সমূহের মধ্যে গুজরাটের উপকূলবর্তী অতি প্রাচীন বন্দর সমন্বিত নাগরিক কেন্দ্র লোথাল সুপরিচিত। নানান কারণে বহুদিন পর্যন্ত এখানকার উৎখননের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রকাশিত হয়নি। সেই দিক থেকে শ্রীরাওয়ের বইটি উৎসাহজনক।

লোথালের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে লেখক এখানে অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই সিন্ধু অববাহিকা এবং তার পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের একটি সাধারণ বিবরণ দিয়েছেন। সিন্ধু সভ্যতার দক্ষিণ ভাগের এই বন্দর কেন্দ্রের কথা কৃষি ও শিল্প, চারুকলা ও কারুকৃতি, সামাজিক জীবন, গমনাগমন ও বাণিজ্য, সিন্ধুলিপি ধর্ম ও অন্ত্যেষ্টি প্রক্রিয়ার সম্পর্কে লিখিত কয়েকটি পরিচ্ছেদে গ্রথিত করে পুস্তকের মাঝখানের অংশটিতে দেওয়া হয়েছে।

বইটির শেষাংশের চারটি অধ্যায়ে পর্যায়ক্রমে আলোচিত হয়েছে সিন্ধুসভ্যতার বা 'হরপ্পীয় সংস্কৃতির' পত্তনকারীদের কথা, ঐ সংস্কৃতির কালানুক্রমের বিবরণ এবং সিন্ধুসভ্যতার উৎপত্তি ও বিনাশের সমস্যা।

পুস্তকের শেষে সংযোজিত 'হরপ্পীয় সংস্কৃতি কেন্দ্রের' তালিকা ও 'কার্বন-১৪' তারিখের বর্গীকৃত উপস্থিতি সাধারণভাবে সকল পাঠককে উপকৃত করবে কারণ এই সংবাদ একস্থানে তুলনামূলকভাবে বিচার করবার মত করে পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

এমনিতে বইটির দশম অধ্যায় বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করবে। কারণ এখনও পর্যন্ত জল্পনা-কল্পনার হলেও সিন্ধুলিপি পূর্ণাঙ্গরূপে বোধগম্য নয় বলেই পরিচিত। শ্রী রাওয়ের মতে মূল লেখ-চিহ্ন পরবর্তী কালীন যুগে প্রায় ২০ টি এবং প্রাচীন বা প্রথমযুগে মোট ৫২টি। লেখকের মতে সিন্ধু সভ্যতার যুগে ভারতীয় ধারায় সুপরিচিত যুক্তাক্ষর প্রচলিত ছিল। সাধারনত দক্ষিণ থেকে বামে লিখিত হরপ্পীয় অক্ষরে একটি অতি প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপিয়ের সঙ্গে সাদৃশ্য ও সম্পর্ক যুক্ত ভাষা ব্যবহৃত বলে এখানে বলা হয়েছে। একাধিক নক্সারছকে দক্ষিণ সেমিতি, ফিনিশীয় প্রভৃতি অক্ষরের সঙ্গে হরপ্পীয় লিপি উপস্থাপিত। দুইটি ছকের মধ্যে সিন্ধুলিপির প্রাথমিক পাঠোদ্ধার করে দেখানো হয়েছে, 'রাজা', 'প্রতিপালক', 'রক্ষাকর্তা', এ ধরনের এর মধ্যে বেশী। শ্রীরাও নিজেই লোথালের উৎখননে প্রধান অংশ নিয়েছিলেন। কাজেই তাঁর মতের হয়ত বিশেষ মূল্য

আছে। কিন্তু সমাজঘটিত কার্যকারণ ও বাস্তব প্রয়োজনের বিচারের সাহায্যেই কেবলমাত্র তাঁর বক্তব্য স্বীকৃতি লাভ করবে।

হরপ্পীয় সমাজে যে বিভিন্ন নরগোষ্ঠির মানুষের সমন্বয় হয়েছিল সেটি প্রত্ন-নৃবিজ্ঞান ও সামাজিক রীতিনীতির দ্বারা সমর্থিত। শ্রীরাও একাধিক সুন্দর যুক্তি দিয়ে দেখাতে চান যে বেদ-পূর্ব আর্যদের সংযোগ ঘটেছিল হরপ্পীয় সংস্কৃতিতে। সিন্ধুসভ্যতার প্রাচীনতর ও পরবর্তীযুগের ঐক্য ও বিবর্তন সম্মত সাদৃশ্য ও পার্থক্য এই বইটিতে আলোকচিত্র ও রেখাঙ্কনের সাহায্যে প্রকাশ করবার চেষ্টা হয়েছে।

অন্য সমস্ত বিষয় বাদ দিয়েও লোথাল বিশেষরূপে বিখ্যাত এখানকার বিশালকায় কৃত্রিম জলাধার ও পোতাশ্রয়ের জন্যে। সেক্ষেত্রে শ্রীরাওয়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ মতামত ও এইটিকে মূল্যবান করে তুলেছে। আমেদাবাদের দক্ষিণ 'ভোগাও' ও 'সবরমতি' নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলের সমভূমিতে লোথাল অবস্থিত। প্রাগৈতিহাসিক সময়ে কাম্বে উপসাগর থেকে এই বর্তমানে স্থলে ঘেরা কেন্দ্রটিতে জাহাজ আসা যাওয়া করতো। পুরাকালে লোথাল ছিল অরণ্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত। লোথালের নাগরিক সৌধ ও পথ-সংস্থানে প্রাচীন সিন্ধুউপত্যকার প্রভাব আছে। লোথালের বন্দর আশ্চর্যজনক। এর কৃত্রিম জলাধারে ইচ্ছামত জল ভর্তি করার ও জল বার করে দেওয়ার ব্যবস্থা উৎখননের ফলে সম্পূর্ণভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এই বন্দর ব্যবস্থা সেই যুগের পৃথিবীর মধ্যে প্রায় অকল্পনীয়। এখনকার বোম্বাই ও বিশাখাপত্তনম 'ডকের' আকার প্রকার ও কর্মউপযোগীতার সঙ্গে লোথালের প্রযুক্তিবিদ্যাকে ভালভাবে দেখার জন্য সেইরকম দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতার একটি ছক দেওয়া হয়েছে। বন্দরের সঙ্গে ব্যবসায় বাণিজ্যের সম্পর্ক অত্যাধিক। এই দিকটি সম্পর্কেও লেখক আমাদের নিরাশ করেননি। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে তাঁর মত এখানে মানচিত্র সহযোগে দেখানও হয়েছে।

সিন্ধু সভ্যতা সম্পর্কে আজও বহুদিন পূর্বেকার আংশিক বিবরণের প্রচারই এখনও পর্যন্ত খুব বেশি। এরকম একটা অবস্থায় শ্রীরাওয়ের পুস্তকটি বিশেষ ভাবে আলোকপাত করবে। সিন্ধুসভ্যতার বিরাটত্ব ও ভারতীয়ত্বকে আজকে সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করার দরকার। সিন্ধুসভ্যতার অন্তিম পর্যায়ের ভারত সভ্যতা বা হরপ্পীয় সংস্কৃতির অন্যান্য কেন্দ্র নিয়ে আরও এধরণের আলোচনা প্রকাশিত হবে বলে আশাকরা যায়। ভারতীয় প্রত্নসমীক্ষা যে সমস্ত হরপ্পীয় কেন্দ্রে হস্তক্ষেপ করেছেন সেইসমস্ত কেন্দ্রের অনেক, কটির 'পরিচয়' এখনও প্রকাশিত হয়নি। আশা করব যে এই কাজ তরান্বিত হবে। কারণ উৎখননের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় না নিয়ে, কিছু প্রকাশ না করে বসে থাকার বর্তমান রীতিটি কোনক্রমেই সমর্থন করা যায় না।

সন্তোষকুমার বসু